অসবর্ণা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৬১

মূল্য—২৷৷০

মুদ্রক : শ্রীসত্যচরণ দাস
আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৷এ, হরি পাল লেন
কলিকাতা ৬

শ্রীমন্মথনাথ সান্ন্যাল

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

ছোট গল্প ঃ-

অসমতল

হলদে বাড়ি

উল্টোরথ

পতাকা

চড়াই উৎরাই

শ্রেষ্ঠ গল্প

কাঠগোলাপ

উপন্যাস ঃ-

দীপপুঞ্জ

অক্ষরে অক্ষরে

দেহমন

দূরভাষিণী

চেনামহল

সঙ্গিনী

গোধূলি

অসবর্ণা

আজ আবার একতলায় অঞ্জলিদের ঘরে পুলিশ এসে হানা দিয়েছিল। আধঘণ্টা যাবৎ ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র তছনছ করে অঞ্জলির ছোট ভাই হাবুলকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। সেদিনের মত আজও পুলিস-সাবইনস্পেক্টারের অনুরোধে সার্চ লিষ্টে আমাকে সই করতে হয়েছে। বিনিময়ে আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তিনি আমার সামনে সিগারেট কেস খুলে ধরে মৃদু হেসে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তারপর আসামীকে নিয়ে সেদিনের মতই সদলে সদর্পে মোটরে গিয়ে উঠেছেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে আর একবার ডুকরে কাঁদতে সুরু করেছেন অঞ্জলির মা। এক পাশে হতভম্ব হয়ে ঠিক সেদিনের মতই দাঁড়িয়ে রয়েছে অঞ্জলির ছোট দুই বোন মিণ্টু আর ঝিণ্টু।

বছর খানেক আগে অঞ্জলির বাবা কালীমোহনবাবু যেদিন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দৃশ্যটা সেদিনও প্রায় অবিকল এই রকমই ছিল। তবু সেদিন আর আজকের দিনে অনেক তফাৎ। অনেক প্রভেদ দু' দিনের অঞ্জলির মধ্যে।

দেড় বছর আগে আমাদের একতলার দু'খানা ঘর পঁয়তাল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়েছিলেন অঞ্জলির বাবা কালীমোহন চক্রবর্তী। হাজরা রোডে আমাদের আরও দু দু-খানা বাড়ি ভাড়া খাটছে। চারু এভেনিয়ুর এই বসত বাড়িতে ভাড়াটে বসাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না আমাদের।

কিন্তু দাদার এটর্ণীবন্ধু নিরুপম চৌধুরী বিশেষ অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছিলেন। পাকিস্থান-ত্যাগী উদ্বাস্তু কালীমোহন চক্রবর্তী তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ভদ্রলোক উঠবার জায়গা পাচ্ছেন না। আপাততঃ কোন রকমে আশ্রয় তাঁকে একটু দিতেই হবে। তারপর সুযোগ সুবিধা পেলেই উঠে যাবেন কালীমোহন বাবুরা।

দাদা হেসে বলেছিলেন, উঠে যা যাবেন তা জানি। আজকাল ভাড়াটেরা যদি একবার মাথা গলায়, তাবা ওঠায় ছাড়া ওঠেনা। কিন্তু নিরুপমকেও তো disoblige করতে পারিনে প্রবীর। অনেক দিনের পুরোন বন্ধু। তা ছাড়া কাজকর্মও খুব দেখে শুনে করে। আমি বলি কি, বাইরের দু-খানা ঘর ওদ আত্মীযদের না হয ছেড়েই দেওয়া যাক্ ঘর দু-খানা তো পাড়ার চাকর-বাকরদের রীতিমত একটা আড্ডার জাযগা হয়ে উঠেছে। তার চেয়ে এক ঘর দুঃস্থ ভদ্রলোক যদি এসে থাকেন ক্ষতি কি। তা ছাড়া মাসঅন্তে গোটা পঞ্চাশেক টাকাও তো আসবে।'

মনে মনে হাসলুম। বন্ধুকে সন্তুষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি পঞ্চাশটি টাকার দিকেও দাদার নজব আছে। ঠিক বাবার মতই খাঁটি বৈষয়িক হয়েছেন দাদা। বাবা বলতেন, 'পযসাকে তুচ্ছ কোরো না। পযসা গুণে গুণেই লাখ টাকা হয়। আবার লাখ টাকা থেকে এক পয়সা গেলে আর লাখ টাকা থাকে না।'

দাদার হিসাবটাও প্রায় ওই রকমই। এখন একটু মন্দা চললেও যুদ্ধের বাজারে হার্ডওয়ার বিজনেসে আমাদের আয় তো নেহাৎ মন্দ হয় নি। তা ছাড়া ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানীর শেয়ার থেকেও বেশ ডিভিডেণ্ড এসেছে। কিন্তু তখনও বাড়ি ভাড়ার খাতে যদি কোন মাসে দশটা টাকা কম আদায় হোত দাদার যেন অস্বস্তির

সীমা থাকত না। সরকার মশাই তিনবার ধমক খেতেন দাদার কাছে।

আমি আর বউদি গোড়ার দিকে খুবই আপত্তি করলাম, 'ভাড়াটে এনে অনর্থক বাড়িতে ভিড় বাড়ানো কেন।'

দাদা সায় দিয়ে বললেন, 'তা ঠিক', বছর কয়েক আগেও এ-পাড়াটা বেশ ফাঁকা ছিল। আবার লোক গিজ গিজ করছে। ভালো লাগে না আর এই সহরের ভিড়। একেক সময় একেবারে হাঁফ ধরে যায়। কসবার বাড়িটা শেষ হযে গেলে এবার ভাবছি সবাই মিলে সেখানেই উঠব গিযে, এটা দিযে যাব কালীমোহন বাবুর দলকে। সহরের বাইরে দিব্যি একটু খোলা-মেলা জাযগায় যেতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যাবে।

বউদি হেসে বলেছিলেন, 'হু, তুমি আবার যাবে ফাঁকা জায়গায়। তোমাকে যেন চিনতে বাকি আছে আমার। মানুষের ভিড় আর গোলমাল ছাড়া তোমার যেন একদণ্ডও চলে। সে কথা বরং ঠাকুরপো বলতে পারে।'

দাদা জবাব দিয়েছিলেন, 'ওর আবার বলবার কি আছে। প্রবীরের পক্ষে কসবাও যা, বড়বাজারও তাই। গোটা কয়েক বইয়ের আলমারী ওর সামনে খুলে দিলেই হ'ল।'

কালীমোহন বাবু কিন্তু ঠিক পঞ্চাশ টাকা দিলেন না। কাকুতি মিনতি করে পাঁচ টাকা কমিয়ে দিলেন। আগাম কিছু সেলামী নেওয়ারও বোধহয় ইচ্ছা ছিল দাদার। কিন্তু বন্ধুর সুপারিশ নিয়ে ওঁরা এসেছেন বলে বোধহয় চক্ষুলজ্জায় বাধল। তবে কালীমোহন বাবুকে একথা স্পষ্টই বললেন।

'ভাড়াটা কিন্তু ইংরেজী মাসের দোসরা সরকার মশাইর কাছে জমা দিতে হবে। আমাদের তাই নিয়ম।'

'আজ্ঞে তাই দেব।'

দাদা এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি করেন আপনি।'

কালীমোহনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে ধর্মতলায় ন্যাশনাল ষ্টোর্সের আমি হেড সেলসম্যান। মাঝে মাঝে ক্যাশেও বসতে হয়।'

দাদা একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বোধহয় আর একটু বেশি পদস্থ ভাড়াটে আশা করেছিলেন। আমার আশঙ্কা হ'ল এবার হয়ত দাদা ভদ্রলোকের মাইনের কথাটাই জিজ্ঞেস করে বসবেন।

নিয়মিত ভাড়া দেওয়ার যোগ্যতা ভাড়াটের আছে কি না সে সম্বন্ধে আগে থেকেই দাদা একটু নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে চান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ভেবে তিনি এবার তাঁর মাইনের কথাটা কালীমোহন বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন না।

কিন্তু কালীমোহনবাবুর বেতনের অঙ্কটা স্পষ্ট না শুনলেও তা'র আর্থিক অবস্থাটা বুঝতে আমাদের দেরী হ'ল না। দেখলাম, ওদের বাড়ির মেয়েরাই জল তোলেন, বাসন মাজেন। একটা ঠিকে ঝি পর্যন্ত কালীমোহনবাবু রাখেন নি।

আমার পিসীমা বালবিধবা। আমাদের সংসারেই ঠাকুর পূজো, জপতপ নিয়ে থাকেন। পাড়াপড়শী ঝি চাকর সকলের ওপরেই তাঁ'র অদ্ভুত সহানুভূতি। শুনলুম তিনি নাকি সেদিন কালীমোহন বাবুর স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'সাত আট মাসের পোয়াতী মানুষ আপনি। আহা-হা, এ অবস্থায় কাজ-কর্ম করতে কত কষ্ট হয়। একটা ঝি-টি রেখে নিলেই তো পারেন।'

কালীমোহনবাবুর স্ত্রী জবাব দিয়েছিলেন, 'ঝি তো রাখতে চাই দিদি। কিন্তু পছন্দ মত লোক পাওয়া যায় কই, যাকে তাকে

রাখতে প্রবৃত্তি হয় না। দু'টাকা বরং বেশি নেয় নিক, কিন্তু হাতের কাজটুকু পরিষ্কার হওয়া চাই। এর আগের ঝিটা ছিল ভারি নোংরা, তার ধোয়া বাসন ফের না ধুয়ে ঘরে নিতে পারতাম না। এবার দেখে শুনেই নেব।'

তারপর দু' মাস গেল তিন মাস গেল, ঝি আর রাখেনি ওঁরা।

আমাদের মেজো ঝি ক্ষেমঙ্করী মুচকি হেসে বউদিকে বলেছিল, 'পিসীমা যেন কি। কিছু বুঝেও বুঝতে চান না। অনর্থক মানুষকে লজ্জা দেন।'

কেবল ক্ষেমঙ্করী কেন, আমাদের বাজার সরকার গণেশ দাসও হাসাহাসি করে। সে বিবরণও কানে এল। কালীমোহনবাবুর সঙ্গে নাকি মাছের বাজারে প্রায়ই দেখা হয় গণেশের। দেখতে শুনতে অমন তো বেঁটে-খাট ঠাণ্ডা মানুষ কলীমোহনবাবু। কিন্তু মেছুনীর সামনে তাঁর নাকি সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি। দাম্পত্য কলহ যেমন তাঁর বাঁধা, মেছুনীর সঙ্গে ঝগড়াটাও তেমনি নিত্যকার। দর কষাকষি শেষ পর্যন্ত তুই তোকারিতে গিয়ে ঠেকে। একদিন রাগ ক'রে থলির মাছ মেছুনীর ডালার ওপর ঢেলে দিয়ে আসেন কালীমোহনবাবু। গণেশ একেক দিন জিজ্ঞেস করে, 'কি চক্কোত্তি মশাই—মাছ নিলেন না?'

কালীমোহনবাবু জবাব দেন, 'না! ওই বরফ দেওয়া মাছগুলি আর নেবনা গণেশ। একেবারে টেষ্টলেস। তার চেয়ে গ্রীন ভেজি-টেবলস্ অনেক ভালো। খেতেও বেশ। স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপকারী।'

'গ্রীন ভেজিটেবলস্ কথাটার মানে কি বউদি ঠাকরুণ—?'—গণেশ একদিন আমার সামনেই জিজ্ঞেস করছিল বউদিকে।

বউদি মৃদু হেসে বললেন, 'কেন রে?'

কাহিনীটা তখন শোনা গেল।

বউদি অবশ্য ধমক দিলেন, 'ছিঃ ওসব সমালোচনা-টোচনা কোরোনা গণেশ। যার যে রকম জোটে সেই সে রকম খাবে।'

কিন্তু গণেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, 'আর কালীবাবু আমাদের যে নিন্দা করেন তার কি হবে? বলেন কি একরাশ বরফ-চাপা মাছ দিচ্ছিস গণেশ, ওতে কি মাছের কোন স্বাদ আছে? তা থাকবে কেন? মাছের স্বাদ আছে কালীমোহনবাবুর একফালি কুমড়ো আর দেড়-পো আলুতে।'

গণেশের বিক্রম দেখে বউদি অবশ্য হাসি চাপতে পারেননি। আর আমি গম্ভীর মুখে সেখান থেকে চলে এসেছিলাম।

তবু এই কালীমোহনবাবুরই যে অঞ্জলির মত অমন একটি সুন্দরী মেয়ে থাকতে পারে, আর সে রোজ কলেজে যাওয়ার জন্য বই খাতা হাতে বাস-স্টপেজে গিয়ে দাঁড়ায়, প্রথম প্রথম এ ব্যাপারটা শুধু ঝি-চাকরকে নয়, আমাদের প্রত্যেককেই বিস্মিত করেছিল।

পিসীমা অনুকম্পার সুরে বলেছিলেন, 'আহা মেয়েটির স্বভাব ভালো, দেখতে শুনতেও বেশ। এবার দেখে শুনে একটা বিয়ে থা দিয়ে দিলেই পারে। পড়িয়ে কি হবে। পড়ানোর কি খরচ কম? এদিকে সংসারের হাল তো এই—'

কিন্তু কালীমোহনবাবুদের এই বিদ্যানুরাগ আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছিল। অবশ্য বিয়ে দেওয়ার সঙ্গতি হয়নি বলেই পড়াতে হচ্ছে একথাও বুঝতে আমাদের বাকী থাকে নি। তবু পরিবারটির যা আর্থিক অবস্থা তাতে মেয়েটির ঘরে বসে বসেই আইবুড়ো হবার কথা বি-এ ক্লাসের ছাত্রী হবার আশা ছিলনা।

আমার লাইব্রেরী ঘরের জানালা থেকে প্রায়ই চোখে পড়ত অঞ্জলিকে। যেদিন কলেজ থাকত না, সেদিন সকালেই মায়ের রান্নার ও

জোগান দিতে আসত। আটপৌরে শাড়িখানা কোনদিন আধময়লা, কোনদিন বা একটু ছেঁড়া। কিন্তু ভোরবেলায় রান্নাঘরের সামনে বসে যখন অঞ্জলি তরকারী কোটে, কি বাটনা বাটে শিল নোড়ায়, তখনও ওকে ভারি অদ্ভুত মানায়। এসব কাজতো সখ করে এক একদিন বউদিও করেন, কিন্তু অমন সুন্দর দেখায় না তো।

অঞ্জলিদের ঘরের সুমুখ দিয়েই আমাদের বেরুবার রাস্তা। যেতে, যেতে এক একদিন মা মেয়ের আলাপ কানে আসে :

'হয়েছে বাপু! আমিই পারব। এসব আর দেখতে হবেনা তোমাকে। তুমি যাও তোমার পড়া-টড়া কর গিয়ে।'

'আমি কি এখনও মিণ্টু, রিণ্টুর মত ছোট আছি নাকি মা যে রোজ রোজ পড়ার তাগিদ দিতে হবে?'

মেয়েটির গলা তো বেশ মিষ্টি, আর ভারি চমৎকার হাসির ভঙ্গিটুকু।

কেবল ওদের রান্নাঘরের দাওয়ায় না, আমাদের সদরে, বাস ষ্টপেজে, কি পার্কের ধারেও মাঝে মাঝে চোখাচোখি হয় অঞ্জলির সঙ্গে। হাতে খান দুই একসারসাইজ খাতার সঙ্গে ওথেলো আর ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স, কোনদিন বা একখণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী, পরনে তাঁতের কমলা রঙের শাড়ি, চুলের রাশ কোনদিন পিঠময় ছড়ানো, কোনদিন বা এলো খোঁপায় স্তূপীকৃত, কোনদিন বা শুধু একটি সর্পিল বেণীতে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আশ্চর্য, দেখে চেনা যায় না, ঠিক এই মেয়েই কলতলায় বসে বাসন মাজছিল, কি ঘর নিকোচ্ছিল খানিক আগে। রাসবিহারী এভেনিউর রিটায়ার্ড সাবজজ এইচ চ্যাটার্জির মেয়ে ডলি, কিংবা সাদার্ণ এভেনিউর ব্যারিষ্টার বীরেন ভাদুড়ীর মেয়ে শুচিস্মিতা, কিংবা সত্য-শিব ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর একডালিয়া প্লেসের পুরন্দীর ভট্‌চাযের বোন পারমিতা ভট্‌চাযের চাইতে মোটেই বেমানান মনে হয়না অঞ্জলিকে। বরং দেখে

দেখে এই বিশ্বাসই আমার দৃঢ়তর হয়, ডলির মত অঞ্জলির গায়ের রঙ অত সুবর্ণপ্রভ না হলেও, শুচির মত চোখ দুটো অত বড় আর উজ্জ্বল না হলেও, কি পরীর মত ঠোঁট দুটি অমন পেলব আর রক্তাভ না দেখালেও অঞ্জলির মধ্যে এমন কিছু আছে, যা ওদের নেই। বিনা প্রসাধনে, বিনা সাধনায় ওর মুখাবয়বে স্নিগ্ধ, শান্ত অথচ বুদ্ধিমণ্ডিত একটি পরিপূর্ণ মেয়ের মুখ ছাব্বিশ বছর বয়সে এই যেন আমি প্রথম দেখতে পেলাম। আর আভাস পেলাম অদ্ভুত এক রহস্যের। দুরন্ত শীতের ভোরে উঠানে বসে একরাশ কাপড় কাচার কায়িক শ্রমের সঙ্গে সেক্সপীয়রের ট্রাজেডির রস যে রহস্যের সৃষ্টি করেছে, আমার কাছে তা বিস্ময়কর আর অতল গর্ভ মনে হল।

বউদি একদিন মুচকি হেসে বললেন 'ব্যাপার কি ঠাকুরপো, এর আগে কোন দিন তো আটটার আগে ঘুম ভাঙত না, আর আজকাল রোজ এত ভোরে কোথায় বেরোও বলতো?'

বউদিকে ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে বললাম, 'দেখ, ঘুম যে মানুষের সব বয়সে, সব ঋতুতে একই সময় ভাঙবে তার কি মানে আছে? তা ছাড়া ক দিন ধরে সূর্যোদয় দেখতে বড় ভালো লাগছে, তাই বেরোই।'

বউদি আমার ধমকে মোটেই ঘাবড়ালেন না। আগের মতই হেসে বললেন, 'ব্যাকরণে ভুল হল নাকি ঠাকুরপো? সূর্য তো তোমাদের ইংরেজী শাস্ত্রের Masculine gender, তার চেয়ে চাঁদ বলাই বোধহয় ভালো ছিল। অন্ততঃ মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনাটা সব দেশের কাব্যেই আছে, শুনেছি। কিন্তু সূর্যের সঙ্গে—'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তুমি বলতে চাও কি?'

বউদি হাসি চেপে বললেন, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। আমরা শুধু দেখতে চাই আর শুনতে চাই।'

কিন্তু বউদি যাই চাননা কেন, অঞ্জলি যেন কোনদিকে চাইতে জানে না, চাইতে চায়না। বাক্-বিনিময়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না, দৃষ্টি বিনিময় হয়না পর্যন্ত। অথচ এ বাড়িতে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের চাকর, ড্রাইভার, বাজার-সরকার থেকে সুরু করে, দাদা, বউদি, পিসীমা, ছোট দুটি ভাইপো-ভাইঝির সঙ্গে পর্যন্ত অঞ্জলির যে অন্তরঙ্গ আলাপ হয়ে গেছে, তা আমার টের পেতে বাকি নেই, শুধু আমার সঙ্গেই ওর আলাপ পরিচয় নিষিদ্ধ। যেহেতু আমাদের বয়সের মধ্যে ব্যবধান কম যেহেতু শিক্ষায়, রুচিতে, মানসিকতায় আমরা সবচেয়ে কাছাকাছি তাই সবাই যেন চক্রান্ত করে আমাদের দূরে দূরে সরিয়ে রেখেছে। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোন পক্ষের গরজ নেই, কোন সুযোগ সুবিধাটি পর্যন্ত জোটেনা, আশ্চর্য, ওরও কি কোন আগ্রহ নেই আমার সঙ্গে আলাপ করবার? কিন্তু তাতো মনে হয়না, চোখাচোখি হলেও চোখ নামিয়ে নেয় বটে, কিন্তু সে দৃষ্টির প্রসন্নতা তো আমার চোখ এড়িয়ে যায় না। ওর সেই আনত চোখের ভাষা আমি যেন দু'কান ভরে শুনি, ওর সেই নতদৃষ্টির সানন্দ অভিনন্দন আমি সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে গ্রহণ করি। আশ্চর্য, তবু আলাপ হয় না। অদ্ভুত সভ্যতার দায়। তার নিয়ম মানতেই হবে, মনের মধ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক ক্ষতি নেই, বাইরে অটুট রাখতে হবে তাকে।

এক একদিন মনে হয় অনন্তকাল ধরে এই চলতে থাকবে। দরজার ধারে, পার্কের কোণায়, রাস্তার মোড়ে আমাদের এমনি দেখা হবে, আর আমরা চোখ ফিরিয়ে নেব, কথা বলবার ইচ্ছা হবে, আর আমরা মুখ ফিরিয়ে নেব, অনন্তকাল ধরে সামাজিক শুকনো আচারের দায় মেনে নেব, অন্তরের মধুর অনুরোধ কানে তুলবনা। আর ভাষাহীন, ঘটনাহীন, হৃদয়হীন কাল দিনের পর দিন এমনি করে একটানা বয়ে চলবে।

কিন্তু অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হ'ল না, পক্ষকালের মধ্যেই আমাদের আলাপের সুযোগ ঘটে গেল। ঠিক সুযোগ নয়, একটুখানি দুর্যোগই বরং এসে সাহায্য করল আমাদের।

ক্লাইভ রো'যের ফার্ম দাদা নিজেই দেখা শোনা করেন, এ ছাড়াও তাঁকে নানা কিছু দেখতে হয়। সুড়কির কারখানা, ফ্যান ফ্যাক্টরি, গ্লাস ওয়ার্কস—নানা বিচিত্র ব্যাপারের সঙ্গে দাদার যোগাযোগ। বাড়ির গাড়ী আর ড্রাইভার তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

আমি তাঁকে বলেছিলাম ওসব ব্যবসা-বাণিজ্য আমি বুঝিনে, ওর মধ্যে আমাকে টানবেন না। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি থাকি আমার লাইব্রেরী আর লেবরেটারী নিয়ে। ডক্টর সা'র সঙ্গে কথাবার্তা আমার এক রকম ঠিক হয়ে গেছে।

দাদা বললেন, 'বেশ তো, তবে আমাদের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্টের দিকেও একটু নজর রেখ। যোগ্য লোকের অভাবে ওর যা হাল হয়েছে—ভাবছি শেষ পর্যন্ত তুলেই না দিতে হয়।'

বললাম, 'কেন, বড বড় ডিরেক্টররা তো সব আছেন আমাদের, মিঃ চন্দ, মিঃ খাসনবিশ—'

দাদা বললেন, 'কিচ্ছুনা, কিচ্ছুনা। কারো দ্বারা কোন কাজ হয়না। একজন এফিসিয়েণ্ট জেনারেল ম্যানেজার দরকার, তার জন্য হাজার বারোশ' পর্যন্ত দিতে আমরা রাজী আছি। কিন্তু লোক কই।'

আমি বললাম, 'লোকের অভাব কি।'

দাদা বললেন, 'লোকের অভাব নেই, কিন্তু যোগ্য লোকের অভাব চিরকালই। আমি ভাবছিলাম তোমার কথা।'

আমি হেসে উঠলাম, 'আমার কথা!'

দাদা বললেন, 'কেন, নিজের যোগ্যতায় নিজেরই সন্দেহ আছে না কি?'

হেসে বললাম, 'তা নয়। কাজটাকেই নিতান্ত অযোগ্য মনে করি।'

দাদাও একটু হাসলেন, 'বেশ তো, ভেবে দেখ।'

ভেবে দাদার প্রস্তাবটা গ্রহণ কবাই ঠিক মনে করলাম, নিজের প্রকৃতিকে তো চিনতে আর বাকি নেই, রুদ্ধদ্বার লেবরেটারীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিবিষ্ট হয়ে যে না থাকতে পারি তা নয়, কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে মনে হয় নিজেকে বঞ্চিত করছি। এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় পৃথিবীর স্বাদ আমার কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল। কি হবে প্রকৃতির রহস্য ভেদের সাধনায়! তার রূপ আগে দু'চোখ মেলে দেখি, তার রসে আগে সমস্ত অস্তিত্ব সিক্ত করে নিই, পড়ে থাকে পদার্থ বিদ্যা। ফের আসি কাব্যসাহিত্যের দ্বারে। আবার কিছু দিন বাদে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভাবি, এই বা কি হচ্ছে। বইয়ের পাতার আড়ালে জগৎকে ঢাকব কেন। কেন মানব অন্যের অক্ষরময়ী ব্যাখ্যা। নিজের ভাগ্য আমি নিজে রচনা করব।

ঠিক এই সময় এল দাদার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্টের ডাক। ডুবুডুবু কোম্পানীকে ভাসিয়ে তুলতে হবে। এতদিন দাদার এই কারবারকে যমের মত ভয় করেছি। কিন্তু আজ ভারি কৌতূহল হ'ল। দেখাই যাক না, কি কাছে এর মধ্যে। কোন রসে দাদা দিন-রাত এর মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকেন। এতে কি আছে রসায়নের স্বাদ, না বৈষ্ণব পদাবলীর অমৃত নির্ঝর?

তা ছাড়া আরও একটা কথা মনে হ'ল। সায়ানস্ কলেজের রিসার্চ ষ্টুডেণ্টের সঙ্গে পরিচয় আছে। দেখেছি কি তাদের কৃচ্ছ্র সাধন! কেউবা সামান্য কিছু এলাউন্স পায়, কেউ পায় না। অনেকরই টুইশানি-নির্ভর সংসার। গোপনে কাউকে কাউকে কিছু দিতে হয় নিজের পকেট খরচ থেকে। কিংবা হাত পাততে হয়

দাদা বউদির কাছে। ভারি খারাপ লাগে। ভাবলুম তার চেয়ে স্বোপার্জিত টাকায় ওদের সহায়তা করব। গবেষণা আমার হবে না, হিতৈষণা যতটুকু হয়। কিন্তু দেখতে গিয়ে ধরা দিলাম, ধরা পড়লাম একথা স্বীকার করতেই হবে। দিনরাত পরিশ্রম করে কোম্পানীকে যে খানিকটা তুলে ধরতে না পারলাম তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর রূপ পালটাতে লাগল। বন্ধুদের ধরে এনে চাকরী দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে গেল বন্ধুত্ব। তারা কেউ আমার স্যুটের রঙের প্রশংসা করে, কেউবা আমার কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় পঞ্চমুখ হয়, কেউবা মহানুভবতায় অভিভূত হয়ে থাকে। অবশ্য বন্ধুপ্রীতির ভাষা তো প্রায় একই আছে। তবু যেন কি নেই, ওর যেন কি বদলেছে। তারাই বদলেছে না আমি ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারি নে। কিংবা বদল হয়েছে সকলেরই।

কেবল কি অফিস? অফিসের বহির্ভূত পৃথিবীও ওই এক বিষয় চক্রে বাঁধা। কোন বন্ধুর ভাগ্নের চাকরী, কারো বা ফার্ণিচারের কনট্রাক্ট। কোন ভূতপূর্ব সহাধ্যায়িনী নিজে খুলেছেন স্টেশনারি স্টোর্স। আমার অফিসে তাঁর দোকানের জিনিসগুলিই সব চেয়ে ভালো মানানসই হওয়া উচিত।

এক এক সময় ক্লান্তি লাগে। তবু এই গ্রন্থি দুশ্ছেদ্য। এ কথা অস্বীকার করতে পারিনে কাজের নেশা আছে। বিশেষ করে সে ক্রিয়া যদি সকর্মক হয়। আর কর্মময় জীবনে কর্তৃপদের মত বাঞ্ছনীয় বস্তু আর নেই।

সেদিন এই রূপান্তরিত জগতের কথা ভাবতে ভাবতে ড্রাইভ করছিলাম, হঠাৎ দ্রুত হাতে ব্রেক কষলাম। রাস্তার মাঝখানে wrong side-এ বাস থেকে একটি মেয়ে নেমে পড়ছে। আর একটু হলে—আর একটু হলে কি যে হোত ভাবা যায় না। নিজের

হৃদপিণ্ডের কম্পন আরও বেড়ে গেল যখন মুখ তুলে দেখলাম সে· মেয়ে অঞ্জলি ও ততক্ষণে ফুটপাতে উঠে পড়েছে। একটু আগেকার বিবর্ণ মৃত্যুভয় ওর মুখ থেকে তখনও ভালো করে মিলিয়ে যায় নি। কিন্তু আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে ওর মুখ ফের বর্ণময় হয়ে উঠল। হিতৈষী অভিভাবকের সুরে বললাম, 'ওই ভাবে বুঝি কেউ পথ চলে। আর একটু হলে কি কাণ্ডটা ঘটাচ্ছিলেন বলুন তো? নিন, উঠে আসুন।'

অঞ্জলি আরক্ত হয়ে বলল, 'না। আমি কাছেই যাব।'

বললাম, 'বেশ তো কাছেই যাবেন। গাড়িতো কেবল দূরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই নয়।'

অঞ্জলি একটু হাসল, 'আপাততঃ তাই তো দিচ্ছিলেন।'

একটু খোঁচা ছিল কথাটায়। কিন্তু খোঁচাটা যেন লেগেছে আমার মনের মৌচাকে। ওর কথায় কেবল অভিযোগ নেই অভিমানও আছে। বললাম, 'দোষটা বুঝি কেবল আমারই। আসুন, ভিড় জমছে।'

অঞ্জলি বলল 'না আজ থাক।'

সেদিনকার মত রইল। আর কোন কথা হ'ল না। কিন্তু মৌনতার বাঁধ ভাঙল। একটু একটু করে বাঁধ ভাঙল কুণ্ঠার, সংকোচের।

অত তাড়াতাড়ি মোটরে না উঠলেও একতলা থেকে আমাদের তেতলার লাইব্রেরী ঘরে উঠে আসতে অঞ্জলির দেরী হ'ল না।

বইয়ে ঠাসা কাচের আলমারীগুলির সামনে খানিকক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অঞ্জলি একদিন বলল, 'এত ভালো লাগে আমার এসব ঘরে আসতে, এত লোভ হয়!'

লোভ! শাস্ত্রকারের ঘৃণিত এই তৃতীয় রিপুবাচক শব্দটিকে যে এমন মধুর করে উচ্চারণ করা যায়, এত অপূর্ব লাগে কারো কারো মুখে, তা আমি এই প্রথম অনুভব করলাম।

একটু হেসে বললাম, 'এ ধরণের লোভ তো ভালোই।'

অঞ্জলি আমার দিকে তাকাল, 'ভালো? কিন্তু সেই সঙ্গে আমার ভয়ও হয়, জানেন?'

একটু অবাক হয়ে তাকালাম। কিসের ভয়ের কথা বলছে অঞ্জলি? লোক-ভয়, অনিশ্চযতার ভয়, ধরা দেওয়ার আগে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে না পারার ভয়, কোন্ ভয়ের ছায়ায় এমন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে ওর আয়ত সুন্দর দুটি চোখ, তা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। ভীরু শঙ্কিত বিহঙ্গীকে আশ্বাস দিযে বললাম, 'আমি তো কোন ভয়ের কারণ দেখছিনে; কিসের ভয় বলুন তো?'

অঞ্জলি বলল, 'এত বই রযেছে, এত জিনিস রয়েছে পড়বার, কিন্তু সময় নেই। ভয় হয় সময় বুঝি কোনদিন পাবও না।'

একটু চুপ করে রইলাম। কদিন ধরে অঞ্জলির মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সংসারের সমস্ত কাজ ওকেই করতে হচ্ছে। সকাল থেকে দেখছিলাম বালতিতে করে জল টানছে, অঞ্জলি বাসন মাজছে, একটু বাদেই বসেছে ওর ভাই হাবুলের শার্টে সাবান মাখাতে।

কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি নেই। খানিক বাদেই কানে গেল নীচে থেকে হাবুল চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করছে, 'ঈস্ এতক্ষণ হুঁস ছিলনা, এখন বসেছে জামায় সাবান দিতে। বেশ তো পারবে না আমাকে বলে দিলেই হোত। আমি অন্য ব্যবস্থা করতাম।'

অঞ্জলি জবাব দিয়েছে, 'ব্যবস্থা তো এখনও করতে পার। কুড়ের বাদশা। এতই যদি দরকার ছিল, নিজের হাতে কেচে নিলেই পারতে জামাটা।'

হাবুল আরও জোরে চীৎকার করে উঠেছে, 'বেশ, বেশ। সরে যাও ওখান থেকে। আমার কোন জিনিস ধরতে হবে না। কোন জিনিস ছুঁতে হবেনা তোমার। দরকার নেই আমার জামা কাপড়ে। মাসে মাসে রাশিকৃত শাড়ি, ব্লাউস আসুক তোমার, তাতেই হবে। মেয়ে কলেজে পড়েন তবে আর কি। তার জন্য আর কেউ খাবেও না, পরবেও না। অর্ধেক মা ষষ্ঠী, অর্ধেক সারা গোষ্ঠী।'

ঘরের ভিতর থেকে ছেলেকে তেড়ে এসেছেন অঞ্জলির বাবা কালীমোহনবাবু, 'এই হারামজাদার ব্যাটা হারামজাদা। এত বাড় হয়েছে তোমার, তুমি আমার কাজের সমালোচনা করতে আসছ। লজ্জা করে না? দু' দু'বার ম্যাট্রিক ফেল করে ধর্মের ষাড়ের মত পাড়া চষে বেড়াচ্ছিস। লেখা নেই, পড়া নেই, কাজ নেই, কর্ম নেই, দিন রাত শুধু খাবি আর কোঁদল করবি। যা, দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে। একবেলাও আর জুটবেনা আমার এখানে।'

কিন্তু এই অকৃতী, মূঢ় গোঁয়ার ছেলের ওপরেই মার মমত্ব সবচেয়ে বেশি।

ঘরের ভিতরে রোগশয্যা থেকে হাবুলের মা অভিমানে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন, 'তাই দাও, ওকে একেবারেই তাড়িয়ে দাও তোমরা। দিনের মধ্যে হাজারবার সকলের লাথি ঝাঁটা খাওয়ায় চাইতে ও শত্রুর আমার চোখের সুমুখ থেকে একেবারে দূর. হয়ে যাক, সেই ভালো।' কিন্তু স্ত্রীর এই অযৌক্তিক সন্তান-বাৎসল্য কালীমোহনবাবুর সহ্য হয়নি, তিনি রুখে বলেছেন, 'তুমিই তো যত নষ্টের মূল। তুমিই তো আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটা খেয়েছ ওর। তোমার জন্যই ও উচ্ছন্নে গেছে।'

অঞ্জলির মা এই অপবাদ সহ্য করতে রাজী হন নি, 'তা তো ঠিকই। ওই না হয় উচ্ছন্নে গেছে, কিন্তু তুমি? তুমি কোন

স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করেছ শুনি? তোমার মাথা তো আর কেউ খায় নি, না কি তাও আমি খেয়েছি?'

অঞ্জলির বাবা হঠাৎ যেন জবাব দিতে পারেন নি। কিন্তু একটু বাদেই দু'জনের তুমুল কলহ আরম্ভ হয়েছে। বাবা মাকে নিরস্ত করবার জন্য কাজ ফেলে ছুটে গেছে অঞ্জলি।

দৃশ্যটা মুহূর্তের জন্য ফের আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু বেশীক্ষণ ভেসে থাকতে পারল না। অঞ্জলির লজ্জা জড়িত স্বর আমার কানে এল—'কিন্তু আপনার বোধ হয় ওসব সমস্যা নেই।'

মৃদু হাসল অঞ্জলি। সুন্দর শুভ্র ঝক্‌ঝকে দাঁতের আভাস। উপমাটা পুরোন হলেও মুক্তার সঙ্গেই তুলনা করতে ইচ্ছা করে। আমার মন ফের মুক্তি পেল সংসারের সমস্ত তুচ্ছতার দৈন্য, কুশ্রীতার অগৌরব থেকে। অঞ্জলির হাসি সব ঢাকতে পারে, সব আড়াল করতে পারে ওর হাসিতে একতলা তেতলার সব ভেদ মিলিয়ে যায়।

বললাম, 'সময়ের সমস্যার কথা বলছেন তো? নেই আবার? নিশ্চয়ই আছে। পড়বার সময় আমিও কি পাই ভাবেন? পরীক্ষা আর প্রফেসরদের তাড়ায় আপনার তবু কিছু না কিছু রোজ পড়তে হয়। কিন্তু আমার তো আর সে বালাই নেই। পড়বার মধ্যে কাগজের হেডিংটা দেখি। বাস্। তারপর সারাদিন-রাতের মত অকলঙ্ক নিরক্ষরতা। অফিসের পর যখন ফিরি, তখন আর কিছু পড়বার মত উৎসাহ থাকে না। I am a lost man।' অঞ্জলি বলল, 'কেন, শুনেছি, আপনার নিজেরই তো অফিস।'

হেসে বললাম, 'অফিস নিজেরই হোক পরেরই হোক, সব এক। ফিস্‌ফিসের জায়গা সেখানে নেই।'

ফিসফিস্ কথাটায় অঞ্জলির মুখে আবীরের ছোপ লাগল। বলল, 'আমি যাই এবার।'

বললাম, 'বই নেবেন না?'

অঞ্জলি বলল, 'কি বই নেব বলুন তো?'

'কোন লাইব্রেরী-টাইব্রেরীতে গেলে আমি ভারি ঘাবড়ে যাই। কি রেখে কি পড়ব ভেবে পাইনে। ইচ্ছা হয় সব পড়ি, যখন ভাবি তা কিছুতেই হবে না, তখন ইচ্ছা হয় সব বাদ দিই।'

বললাম, 'আশ্চর্য, এ ব্যাপারেও আপনার সঙ্গে আমার ভারি মিল আছে দেখছি।'

অঞ্জলি হাসল, 'তাই নাকি? বড ভয়ের কথা তো?'

বললাম, 'সব কথাই যদি ভয়ের কথা হয়, তা'হলে আর কথা হয় কি ক'রে?'

অঞ্জলি একটু চুপ করে রইল। তারপর আবার ফের বলল, 'কি বই নেব বলুন?'

'আমি কি বলব? যা খুসি নিন।'

অঞ্জলি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল, 'তা'হলে ওই বইটাই দিন। বীথি সেদিন বলছিল বইটার কথা।'

বললাম, 'কোন্‌টা? Body's Rapture? আপনি তো ভারি সাঙ্ঘাতিক মেয়ে দেখছি। ও বই আপনাকে দেওয়া কি ঠিক?'

অঞ্জলি তরল স্বরে বলল, 'বাঃ, আপনিও কি গুরুমশাইগিরি সুরু করলেন?'

কিন্তু সুরু করলেও গুরুত্ব বেশি দিন রাখতে পারলাম না। নিজের অজ্ঞাতে কি ক'রে যে এই মেয়েটির সামনে নিতান্ত লঘু হ'য়ে পড়লাম তাই ভাবি। অফিসে বেশীর ভাগ লোকই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু

তাঁদের ভাবভঙ্গী সব কনিষ্ঠের মত। প্রথম প্রথম কেমন যেন অস্বস্তিই লাগত। আমাদের অন্যতম ডিরেক্টর ষাট বছরের বুড়ো মিঃ খাসনবীশ পর্যন্ত যখন আমার সঙ্গে পরম সমীহের সঙ্গে কথা বলতেন, আমার প্রত্যেকটী মত অভ্রান্ত ব'লে স্বীকার করতেন, তখন সংশয় হোত—আমি নিজেও বুঝি ষাট পার হ'য়ে গেছি। হয়ত আয়নার সামনে দাঁড়ালে এক্ষুনি চোখে পড়বে আমার চুল সব সাদা, দাঁতের একটিও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু মাস কয়েক যেতে না যেতেই আমার অস্বস্তি কাটল। এই সম্মান, এই শ্রদ্ধা, এই ভয় তো আমাকে নয়, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্টের জেনারেল ম্যানেজারকে। অর্থগৌরবে, পদমর্যাদায় এসব তার ন্যায্য প্রাপ্য—অফিসের ডিসিপ্লিন রক্ষার জন্য একান্ত অপরিহার্য। তাই চেম্বারে বসে যদি কোন কেরানীর একটু হাসির শব্দ কানে আসে, যদি চোখে পড়ে মিঃ খাসনবীশ কম কাজ করছেন, স্বস্তি পাইনে; কেমন যেন আশঙ্কা হয় অফিসে ডিসিপ্লিনের ত্রুটি ঘটল। গাড়ী অফিসের দোরগোড়ায় থামবার সঙ্গে সঙ্গে ওজন ভারি হ'য়ে যায়, মুখের ভাব আপনিই বদলায়, চেম্বারে ঢুকলে খাস বেয়ারা নীলাম্বর আমার গায়ের কোট খুলে নেয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অদৃশ্য আরদালী আমার স্বভাবের সঙ্গে লৌহবর্ম এঁটে দিতে কসুর করে না।

সেই ভারি সীসার বর্মটিও কৌতুকী মীনধ্বজের ছোঁয়ায় খসে পড়ল। তাকে বেয়ারা বলতে ভরসা হয় না, নিজেই সেই মহাপ্রভুর বেয়ারা হ'য়ে আছি কিন্তু আড়ালে বেয়াড়া ব'লে গাল পাড়তে ভারি ইচ্ছা করে। কি ক'রে এমন হ'ল। অঞ্জলির সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান, রুচির ব্যবধান, বিদ্যাবুদ্ধির ব্যবধান এমন ভাবে ভুলে গেলাম কি ক'রে। উনিশ কুড়ি বছরের বি, এ, ক্লাসের একটি ছাত্রের সঙ্গে কেউ যদি আমাকে দু'মিনিট আলাপ করতে বলে, আমি নিশ্চয়ই ক্লান্তি বোধ

করব। কিন্তু অঞ্জলির সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি ভাবে কেটে যায় টেরও পাইনে। কিংবা ভুল বললাম, টের পাব না কেন, নিশ্চয়ই পাই, প্রতিটি মুহূর্তকে সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করি। কি বলে অঞ্জলি, তা শুনতে ভুলে গিয়ে ও কেমন ক'রে বলে তাই দেখি। ওর হাসির আভা লাগে কানের দুলে, চিবুকের তিলটি স্পন্দিত হয়। বেহালার এক নির্জন মজা পুকুরের ধারে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে হঠাৎ অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে তাকায়, মধুর গঞ্জনা গুঞ্জিত হ'তে শুনি ওর কণ্ঠে, 'যাও, তুমি কিচ্ছু শুনছ না। তোমাব মন নেই।'

হেসে বলি, 'আছে। মণি হ'য়ে চোখের মধ্যে স্থান নিয়েছ। ভালো ক'রে চেয়ে দেখ।'

কিন্তু আমার দিকে চেয়ে দেখে না অঞ্জলি। পানাভরা পুকুরের দিকে চুপ করে চেয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'দেখ আমার ভারি ভয় হয়।'

বলি, 'ভয় তো তোমার সেই গোড়া থেকেই। সেই যেদিন মোটর-চাপা পড়তে পড়তে একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছিলে।'

অঞ্জলি বলল, 'এখন ভাবি, বেঁচে না গেলেই ভালো হোত, বেঁচেই তো মরলাম।'

একটু চুপ ক'রে রইলাম। আশাতীতভাবে অতি অল্প দিনেই অঞ্জলি কাছে এসেছে। কিন্তু ঠিক যেন আসেনি। ঠিক ধরা দেয়নি। দ্বিধায়, কুণ্ঠায়, শঙ্কায়, সঙ্কোচে পানাভরা পুকুরের মতই মন ওর আচ্ছন্ন। আমি জানি ওর ভয়টা কিসের। ভয় আমার ঐশ্বর্যকে। এই ঐশ্বর্যে ওর বিশ্বাস নেই, কিন্তু স্পৃহা আছে। আমার বাড়ি, গাড়ি, আসবাব-আড়ম্বর ওকে যত দূর ঠেলেছে তত কাছে টেনেছে। আমি তো দেখেছি আমাদের ডলি-শুচিরা যে সব সামান্য বস্তুতে কিছুমাত্র ঔৎসুক্য

বোধ করত না, তাতেও ওর কি কৌতূহল, কি আনন্দ! বৌদির প্রত্যেকখানির শাড়ি আর গয়নার সঙ্গে, বাড়ির আসবাবপত্রে, গাড়িতে ক'রে সদলবলে পিক্‌নিক্ করতে যাওয়ায় অঞ্জলির বিস্ময় জড়িয়ে আছে। কিন্তু সেই বিস্ময় আর উন্মুখতাকে ও প্রকাশ করতে চায় না। অতি সন্তর্পণে চাপা দিয়ে রাখতে চায়। তবুও যদি কোন ফাঁকে তা একটু প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, ওর লজ্জা আর অনুশোচনাব সীমা থাকে না। এসব আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তবু অঞ্জলি অঞ্জলিই। ওর কৌতূহল, স্পৃহা আর আনন্দে ওর খুসি হওয়ায আমার সমস্ত বৈভব যে ধন্য হয়েছে, সার্থক হয়েছে, তাও তো অঞ্জলির কাছে চাপা থাকেনি। তবু কেন ওর ভয, কিসের ওর আশঙ্কা। অন্য দিনের মত সেদিনও জিজ্ঞেস্ করলাম কথাটা।

ও বলল, 'আমাদের মিল কি সম্ভব? তুমি কি সত্যিই ভালোবাসতে পার আমাকে?'

বললাম, 'কেন পারিনে? তুমি যা খাও, আমি তা খাইনে; তুমি যা পর, আমি তা পরিনে; তোমাকে বাসে ট্রামে কলেজ করতে হয়, আমার বুইক্ আছে, এই জন্যে তোমাকে ভালোবাসতে পারিনে ভাবছ? নাকি এছাড়া আর কোন ব্যবধান আছে তোমার আমার মধ্যে?'

অঞ্জলি বলল, 'কিন্তু এ ব্যবধানগুলি কি কম?'

বললাম, 'অনেক কম আর অনেক ঠুন্‌কো। এ ব্যবধান গায়ের চামড়া নয়, গায়ের পোষাক। যে কোন মুহূর্তে এটা খুলে ফেলা যায়।'

অঞ্জলি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'ফেলা যায়? ফেলতে তুমি পার?'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'পারি বই কি। কিন্তু আমার সেই পারা তোমার পারার ওপর নির্ভর করে। তুমি যদি তেমন ক'রে

বলাতে পার, তুমি যদি তেমন ক'রে খোলাতে পার—আমি না পারি কি ? আমাদের ব্যবধান তো অতি তুচ্ছ ব্যবধান, কত রাজ-ঐশ্বর্য মানুষ প্রেমের জন্য ছেড়ে এসেছে, তাতো কেবল কাব্যে নেই, ইতিহাসেও আছে। কিন্তু ছাড়তেই বা হবে কেন অঞ্জু। আমার সম্পদ কি তোমারও হতে পারেনা ?'

অঞ্জলি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু তোমার দাদা বউদি কি রাজী হবেন ?'

বললাম, 'না রাজী হওয়ার তো কোন কারণ নেই। ওঁদের কাছে সামাজিক বাধাটাই তো সবচেয়ে বড় বাধা। তেমন সামান্য কোন বাধাও তো দেখছিনে। দুজনেই বামুন। এমন কি কুলীন মৌলিকের পার্থক্যটুকু পর্যন্ত নেই। আমি ভট্টচার্য, তুমি চক্রবর্তী, দু'পুরুষ আগে দু'জনের বাবা-দাদাই হয়তো যজমানী করতেন।'

অঞ্জলি বলল, 'কিন্তু—'

বললাম, 'ফের কিন্তু ? তোমার কিন্তু পরন্তুর কি শেষ হবে না ?'

অঞ্জলি একটু হাসল, 'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?'

না, ব্যস্ত আমি হইনি, কতবার ইচ্ছে হয়েছে ওর ছোট সুন্দর নরম হাতখানা নিজের মুঠির ভিতরে ভরে রাখি, কতবার ইচ্ছে হয়েছে ওই পরিপূর্ণ পেলব দুটি ওষ্ঠাধরের স্বাদে বুভুক্ষ অন্তর ভরে নিই। কিন্তু সেই উদগ্র বাসনাকে সংযত করবার শিক্ষা আর সামর্থ্য আমার আছে। বন্ধুরা হয়ত শুনলে ঠাট্টা করবে, এসব আমার দুর্বল ভীরুতা। কিন্তু তা নয়। আর একটি ভীরু মেয়ের ভয়কে আমি ভালোবেসেছি, সম্মান করেছি। আমি ব্যস্ত হব না, ভুল বুঝাবার কোন অবকাশ দেব না ওকে। মনে করতে দেবনা আমি ওর অবস্থার বিন্দুমাত্র সুযোগ নিচ্ছি, জাহির করছি সম্পদের জোর। আমাদের সমাজের কোন মেয়ে

হলে আমি দেহকে এমন ভয় করতাম না, শুচিতার মিথ্যা মোহকে প্রশ্রয় দিতাম না, কিন্তু এখানে দিতে হবে। ও বুঝুক, আমি কোন সুযোগের লোভী নই, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগই আমার কাম্য। ওর মনের সংশয় ঘুচুক, দ্বিধা দূর হোক, ততদিন আমি অপেক্ষা করব। সামাজিক অনুমোদন ছাড়া ও যদি বল না পায়, পুরোহিতের অশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ ছাড়া ওর মনে যদি পরিপূর্ণ নির্ভরতার আশ্বাস না আসে, তাই হবে।

তারপর একদিন বললাম বউদিকে। বউদি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বল কি ঠাকুরপো, একতলার ওই অঞ্জলিকে বিয়ে করবে তুমি? এত ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছে কত ভালো ভালো ঘর থেকে, তখন কিছুতে তোমাকে টলানো যায়নি, আর এখন কি না ওই পচা শামুকে তোমার পা কাটল?'

উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'পচা শামুক তুমি কাকে বলছ বউদি? অঞ্জলিরা ভিন্ন জাত নয়, অবশ্য তা-ও যদি হোত, আমাকে আটকাতে পারত না।'

বউদি অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে হাসলেন, 'ও বাবা, এরই মধ্যে এত? এই তো মাস কয়েকের মাত্র জানা শোনা তারই মধ্যে—'

বললাম, 'হ্যাঁ, তারই মধ্যেই। পুরোহিত মন্ত্র পড়াবার আগে তোমার আর দাদার মধ্যে তো কয়েক মিনিটের আলাপও ছিলনা, তবু তো জানতে শুনতে বেশী দেরী হয়নি।'

কিন্তু বউদি কাব্যের ধারেও ঘেঁষলেন না—পরম বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি ভেবে অবাক হচ্ছি ঠাকুরপো, অঞ্জলির মধ্যে তুমি কি দেখলে, ওর চেয়ে ঢের ফর্সা মেয়ে কি আমাদের সমাজে নেই, কি ঢের শিক্ষিতা? স্যার বাহাদুর শশাঙ্ক মুখুয্যের মেয়ে মিনতি তো

এম, এ, পাশ করেছে। একটু কম বয়সী মেয়েই যদি চাও, তাও তো যথেষ্ট আছে।'

বললাম, 'তা আছে ; কিন্তু অঞ্জলি যথেষ্ট নেই, সে একটিই।'

বউদি রাগ ক'রে বললেন, 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারিনে ঠাকুরপো।'

আমি রাগ করলাম না, হেসে বললাম, 'তোমাকে বোঝাতেই কি আমি পারি বউদি ?'

কিন্তু দাদাকে বোঝাতে হোল, তিনি বুঝতে চাইলেন। দাদা যে আমার চেয়ে বার বছরের বড, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্টের জেনারেল ম্যানেজার হয়ে তা ভুলেই গিয়েছিলাম, তাঁর মুখ দেখে আবার মনে পড়ল।

দাদা তাঁর শোয়ার ঘরে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে প্রথমে খানিকক্ষণ বৈষয়িক আলোচনা করলেন, তারপর হঠাৎ এক সময় মৃদু হেসে মিষ্টি করে বললেন, 'তোমার বউদির সঙ্গে বুঝি সেদিন খুব ঠাট্টা করেছিলে ; কিন্তু ও ভেবেছে সত্যি। সেই থেকে আমাকে যখন তখন জ্বালাতন করে মারছে। আগে আগে তোমার বউদির বেশ রসিকতা বোধ ছিল, ঠাট্টা তামাসাটা বুঝত, কিন্তু আজকাল সব গেছে।'

দাদা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। মনে হোল সে নিঃশ্বাস শুধু নাকের নয়, অন্তরেরও।

একটু দূরে মেঝেয় বসে বউদি পান সাজছিলেন, একবার রুষ্ট ভঙ্গীতে মাথা তুললেন, কিন্তু দাদার চোখের দিকে তাকিয়ে ফের পানের বাটায় চোখ রাখলেন, আর কোন কথা বললেন না।

কিন্তু আমি কথা বলতেই এসেছি। স্পষ্ট কথা সহজ ভাষায় বলতে চাই, ভূমিকা বাড়াতে ইচ্ছা নেই আমার। তবু একটু গুছিয়ে নিয়ে বললাম, 'অনর্থক বউদির দোষ দিচ্ছেন। আমার তো মনে হয়, বউদির

রসবোধ ঠিক আগের মতই আছে, একটুও বদলায়নি। এখনো সপ্তাহে ছুটি সিনেমা, আর তিনখানা ডিটেকটিভ বই ওঁর বাঁধা, ব্রীজ খেলায় চুরিতে আমি এখনো ওঁর সঙ্গে পারিনে।'

আমি একটু হাসলাম।

দাদা হাসলেন না। আমার চাপল্যে বেশ একটু বিরক্ত হলেন তারপর একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, 'একটি কথা বলবার জন্য তোমাকে ডেকেছি প্রবীর। কথাটা না বলতে হলেই খুশি হতাম। তুমি আমার চেযেও উচ্চশিক্ষিত, হযতো আমার চেয়েও বুদ্ধিমান। তোমার জন্য গর্বের আমার শেষ নেই। কিন্তু তোমার নামে এসব যা তা শুনতে হবে, আমি আশা করিনি। প্রশান্ত ভটচাযের ভাইকে কেউ নিন্দা করুক, তার চরিত্রের দুর্বলতা নিয়ে হাসাহাসি করুক, তা আমি মোটেই সহ্য করব না।'

মুহূর্তকাল স্তম্ভিত হযে থেকে বললাম, 'আমিও করব না। আপনার এতখানি বিচলিত হওয়ার কোন কারণই ঘটেনি।'

দাদা রুঢ়স্বরে বললেন, 'ঘটেনি, তুমি বললেই তো হবেনা। এ বাড়ির ঠাকুর-চাকরের পর্যন্ত দুটো করে চোখ আছে, দুটো করে কান আছে। যতক্ষণ ব্যাপারটা তোমাদের ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয মাত্র ছিল, আমি কোন কথা বলিনি। কিন্তু এখন সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন বিষয়টা শুধু ব্যক্তিগত নয়, পরিবারগত, সমাজগত; আমাকে বাধা দিতেই হবে।'

বললাম, 'কিন্তু আমি যদি অঞ্জলিকে রীতিমত সমাজ-সম্মতভাবে বিয়ে করতে চাই, তাতে আপনার বাধা দেওযার প্রশ্ন কিসে ওঠে?'

দাদা আমার মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, 'বিয়ে করতে চাও? তুমি তা হলে মন একেবারে ঠিক করে ফেলেছ? ওদের সঙ্গে আমাদের মিলবে?'

বললাম, 'না মেলার তো কোন কারণ দেখিনে। ওঁরা ধনী নন, এই যদি আপনার আপত্তির কারণ হয়, তা হলে যুদ্ধের আগে তাঁয়ে-মশায়রাও তো সাধারণ মধ্যবিত্তই ছিলেন।'

দাদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বেশ, আমার আর কিছু বলবার নেই। কর তোমার যা খুসী!'

দু'তিনদিনের মধ্যে দাদা আমাব সঙ্গে আর কোন কথা বললেন না। বউদিও অত্যন্ত মিতভাষিণী হয়ে গেলেন। তবু সংসার যথারীতি চলতে লাগল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করেই বুঝতে পারলাম ঠিক যথারীতি যেন থাকেনি, বেশ খানিকটা রীতিভঙ্গ হয়েছে।

কাজ কর্মের ফাঁকে অঞ্জলি মাঝে মাঝে ওপরে আসত। পিসীমাকে কীর্তন শোনাত, বউদির তাসের আসরেও মাঝে মাঝে দেখা যেত ওকে। কিন্তু কদিন অঞ্জলি আর ওপরে এল না। ওর ছোট বোনেরা এসে শাড়ি শুকোতে দিয়ে যায়। অঞ্জলির মা একটি মৃত সন্তান প্রসব করে একেবারেই শয্যা নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমার খুব কমই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু প্রায় নিয়মিত দেখা হ'ত কালীমোহন বাবুর সঙ্গে। সামনে পড়লেই তিনি স্মিতমুখে কুশল প্রশ্ন করতেন, 'এই যে, ভালো?'

ক্রিয়াপদটা উহ্য রাখতেন কালীমোহন বাবু। মেয়ের প্রেমাস্পদকে ঠিক আপনি বলবেন, কি তুমি বলবেন, যেন স্থির করতে পারতেন না। ক্রিয়াপদটা হয় উহ্য থাকত, না হয় থাকত ভাববাচ্যে 'আফিসে বেরুনো হচ্ছে বুঝি?' আমি মৃদু হেসে ঘাড় নাডতাম। হয়ত আরও ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল ওঁদের সঙ্গে। কিন্তু আমি তেমন মিশুক প্রকৃতির নই। আকস্মিক আত্মীয় সম্বোধনে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠবার ক্ষমতা আমার স্বভাবে নেই। তবু একাধিক দিন গিয়েছি কালীমোহনবাবুদের ঘরে।

খাবার না খেলেও চা খেয়েছি। অঞ্জলির ছোট বোনদের সঙ্গে আলাপ করেছি। অঞ্জলির মা নানা প্রসঙ্গে তার কথা তুলেছেন। ওর যা রূপ, ওর যা রুচি, যা বিদ্যা-বুদ্ধি, তাতে বড়লোকের ঘরেই ওর জন্মান উচিত ছিল; তা হলে হয়ত বড়লোকের ঘরে পড়তে পারত। অঞ্জলির অদৃষ্ট, কিন্তু মেয়েকে বড়লোকের ঘরের যোগ্য করে তুলতে অঞ্জলির বাবা-মা'রা নাকি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। ছেলেটার তো কিছু হোল না, কিন্তু সেই দুঃখে মেয়েকে গো-মূর্খ করে রাখেননি। কিংবা নানা জনের নানা নিন্দা-মন্দ শুনেও কোন অযোগ্য পাত্রের হাতে সঁপে দেননি। নিজেরা কষ্টে থেকেও মেয়ের সাধ-আহ্লাদ, মরজি মেনে চলেছেন, তাকে সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়েছেন লেখা-পড়ার। কলেজেই যেন আধা মাইনে। কিন্তু আরো তো খরচ আছে। একটি ছেলেকে পড়ানোর চাইতে একটি মেয়েকে পড়াবার খরচ চতুর্গুণ বেশী। সেই খরচে কার্পণ্য করেননি অঞ্জলির বাবা-মা। এখন মেয়ের ভাগ্য। তবে এইটুকু তাঁরা বলতে পারেন যে অঞ্জলিকে যে নেবে সে ঠকবে না। ওকে গরীবের ঘরেও যেমন মানাবে, রাজার ঘরেও তেমনি।

তা মানাবে। কিন্তু ভাবী শ্বশুর শাশুড়ী হিসাবে অঞ্জলির বাবা-মাকে আমার মনের সঙ্গে ঠিক যেন সাজাতে পারিনি। কোথায় যেন বেধেছে। নিজের এই সঙ্কীর্ণতাকে শাসন করতে অবশ্য আমি ছাড়িনি। ছিঃ আমিও কি মানুষকে কেবল তার আর্থিক সঙ্গতি দিয়েই বিচার করব? আর কিছু দেখবনা? কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি কল্পনাও মনে মনে আপনা থেকেই যেন গড়ে উঠেছে। অঞ্জলির গোত্র বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর বাবা-মাও কি বদলাবেন না? ওঁরা কি এই একতলার ঘরেই থাকবেন? আমরা কসবার বাড়িতে উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ির দোতলার ঘরগুলিও ওঁদেরই ছেড়ে দেব। অঞ্জলির বাবাকে

ছাড়িয়ে আনব ন্যাসনাল ষ্টোর্স থেকে। না, নিজের অফিসে ওঁকে নেব না, সেটা আমার নিজেরই খারাপ লাগবে; তবে স্বাধীনভাবে কালীমোহনবাবু যাতে একটা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারেন তার একটা বন্দোবস্ত করতে হবে বইকি।

কালীমোহন বাবুর শিষ্ট ভাষণের জবাবে আমিও তাই মিষ্টি করে হেসেছি, হাতে সময় থাকলে জিজ্ঞাসা করেছি তাঁর কাজ কর্মের কথা, এক-আধদিন যোগ দিয়েছি প্রাকৃতিক আবহাওয়া আর রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনায়। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম কালীমোহনবাবুও নির্বাক গম্ভীর হযে গেছেন। তাঁর সেই ভাব-বাচ্য পর্যন্ত উহ্য।

বুঝতে পারলাম কিছু একটা হয়েছে। দাদার উপর রাগ হোল। তিনিই হয়তো আড়ালে ডেকে কিছু বলেছেন কালীমোহনবাবুকে। কিন্তু ভালো ক'রে খোঁজ নিয়ে জানলাম দাদা নিজে কিছু বলতে যাননি। কালীমোহন বাবু বাজারে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ফিরিয়ে এনে পথের মধ্যে আর একজন ভদ্রলোকের সামনে সরকার মশাই ভাড়ার তাগিদ দিয়েছেন, বলেছেন, এ-মাস ধ'রে এই তিন মাসের ভাড়া পড়ল বাকি। এমন হলে সরকার মশাই আর পারবেন কি করে। বেশ তো এত ভাড়া দিতে যদি কষ্টই হয় কালীমোহন বাবুর সরকার মশাইর জানা অনেক বস্তিটস্তি আছে। বস্তি বলে খারাপ কিছু নয়। দিব্যি খটখটে বাড়ি। বেশ আলো-বাতাসও আছে। অথচ ভাড়াও কম। অনেক ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দিব্যি সেখানে বাস করছেন।

কালীমোহনবাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে আমতা আমতা ক'রে নাকি জবাব দিয়েছেন, 'এতদিন তো ভাড়া বাকি পড়েনি সরকার মশাই। ঠিক মাসের দোসরা তারিখেই দিয়েছি। কিন্তু এই ক'মাস ধরে রোগীর পিছনে কি রকম খরচটাই হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন তো।

গোড়ার দিকে বাঁচবার তো আশাই ছিল না। বেশ এই সপ্তাহের মধ্যে আপনার সব ভাড়া মিটিয়ে দিতে পারলেই তো হলো।'

সরকার মশাই হেসে বলেছেন, নিশ্চয়ই, ভাড়াটা মিটিয়ে দিলে আর কথা থাকে কি।'

কালীমোহন বাবুকে ভাড়ার তাগিদ দেওয়ার জন্য দাদার উপর আমি অসন্তুষ্ট হলাম। কিন্তু অঞ্জলির বাবার ব্যবহারেও খুসি হতে পারলাম না। আমাদের সম্বন্ধ যে কি ডেলিকেট তা তো তাঁর অজানা নেই, তবু কেন তিনি বাকি রাখতে গেলেন ভাড়া। আমি হ'লে তো পারতাম না। যেমন করেই হোক এক্ষেত্রে বাড়িওয়ালার ভাড়া মিটাতাম আগে।

কালীমোহন বাবু চুপ ক'রে গেলেও তাঁর স্ত্রী সেদিন ডেকে পাঠালেন। সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরে ইজিচেয়ারটিতে সবে গা এলিয়ে দিয়েছি অঞ্জলির ছোট বোন রিণ্টু এসে বলল, 'মা আপনাকে ডাকছেন প্রবীর দা।'

এমন সরাসরি আমন্ত্রণ এর আগে তিনি কোনদিন পাঠাননি। একটু অবাকই হলাম; বললাম 'আচ্ছা যাচ্ছি।'

মেঝেয় বিছানা পেতে শুযেছিলেন অঞ্জলির মা, অঞ্জলি ব্যস্ত ছিল রান্নার আয়োজনে, কালীমোহন বাবু তখনো ফেরেননি। অঞ্জলির মা বললেন, 'এসো বাবা, ও রিণ্টু, জলচৌকিটা এনে দে এখানে, কি যে করিস তোরা।'

বললাম, 'জল চৌকির দরকার নেই। আপনার শরীর কেমন আছে আজকাল।'

তিনি একটু হাসলেন, বললেন, 'ভালোই আছি।' মাথার কাছে দাগ কাটা মিকশ্চারের শিশি। খোসার সঙ্গে কয়েক রোয়া কমলা

লেবু। হাসিটুকু খুব স্বভাবিক দেখাল না। তবু মনে হোল হাসির ভঙ্গিতে কোথায় যেন একটু মিল আছে অঞ্জলির সঙ্গে।

তিনি আবার বললেন, 'কই জল চৌকিটা দিলিনে তোরা? প্রবীর যে দাঁড়িয়ে রইল।'

সম্বোধন নিয়ে কালীমোহন বাবুর যে সমস্যা আছে তাঁর স্ত্রীর তা নেই। আমার নাম থেকে সহজেই বাবু তিনি ছেঁটে ফেলেছেন।

রিণ্টু বলল, 'কি ক'রে আনব মা, দিদি যে সেটায় চেপে বসে রান্না করছে।'

হঠাৎ খিল খিল ক'রে হেসে উঠল রিণ্টু।

অঞ্জলির মা বললেন, 'হাসছিস কেন অত। রাঁধতে আবার জলচৌকি লাগে নাকি, মেম সাহেব হয়েছেন মেয়ে। আসনটা বের ক'রে দে।'

কিন্তু আসন বের করবার আগেই অঞ্জলি চৌকিখানা নিয়ে এসে পেতে দিতে দিতে বলল, 'রিণ্টুটা বড় ফাজিল হয়েছে মা। ওকে শাসন করা দরকার। জলচৌকিতো বারান্দায় অমনিই পড়ে ছিল, আমি পেতে বসব কেন।'

অঞ্জলির মা বললেন, 'কোথায় গেল পাজী মেয়েটা, হতচ্ছাড়ীকে দেখাচ্ছি আমি।'

কিন্তু রিণ্টুর আর দেখা নেই। ফ্রক পরা ন' বছরের মেয়ের দুষ্টুমিতে আমি মনে মনে হাসলাম।

পরমুহূর্তেই পরিবেশটা ফের গাম্ভীর্যে ভরে উঠল। অঞ্জলির মা বললেন, 'তোমাকে একটি কথা বলবার জন্য ডেকেছি বাবা। তোমার পিসীমা আজ আমাদের অপমান করেছেন।'

বললাম, 'অপমান করেছেন? কেন?'

'কেন, তা তুমিই তো সবচেয়ে ভাল জানো।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

তিনি বলতে লাগলেন, 'শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা একজন আর একজনের সঙ্গে মিশবে, তাতে দোষের কি আছে। আমি তাই ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম তাদের বয়স হয়েছে, তারা লেখাপড়া শিখেছে, তাদের ভালোমন্দ তারা বুঝবে। কিন্তু দেখলাম, তারা এখনও তা বুঝতে শেখেনি, তুমি নাকি বলেছ—'

বললাম, 'হ্যা বলেছি। আপনাদেরও তাই বলি। হয়ত আগেই বলা উচিত ছিল। অঞ্জলিকে—অঞ্জলিকে আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি।'

অঞ্জলির মা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কিন্তু তোমার পিসীমা, দাদা বউদি—'

বললাম, 'তাঁদের মত নেই। কিন্তু বিয়ে তো আর তাঁরা করবেন না।'

অঞ্জলির মা ফের একটু কাল চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন, 'তার চেয়ে আমরা এখান থেকে উঠে যাই সেই ভালো। আমি ওঁকেও তাই বলেছি। বলেছি সরকার মশাইকে সব ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে—'

হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'হ্যাঁ ভাড়া বাকি রাখাটা কালীমোহনবাবুর সঙ্গত হয়নি। তার চেয়ে আমাকে যদি জানাতেন—'

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন অঞ্জলির মা, তারপর রোগশীর্ণ ঠোঁটে ফের একটু হাসলেন, 'তোমার তো এসব জানবার কথা না বাবা। আমাকে জানাতে পারতেন আমাকেই তিনি জানাননি। যতদিন টাকা পয়সার ভার আমার হাতে ছিল, আমি বেশ চালিয়ে নিয়েছি। মাসের মাইনে এনে হাতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘর ভাড়ার টাকাটা আলাদা ক'রে রেখেছি। মাসের শেষদিকে কষ্ট হয়েছে সংসারের কিন্তু মান সম্মান নিয়ে এমন টান পড়েনি।'

আমি বললাম, 'না না মান-সম্মানের কোন প্রশ্ন—'

অঞ্জলির মা বললেন, 'কিন্তু এখন তো আর পুরো মাইনে আনতে পারেন না বাড়িতে, আমার হাতেও দেন না, নিজেই সব দেখেন। তার ফল হয়েছে এই। তবু আমি ভাড়ার কথা জিজ্ঞেস করেছি। উনি বলেছেন সব দেওয়া হয়ে গেছে। আগে তো এমন ছিলেন না উনি, মিথ্যা বলতেন না আমার কাছে—'

জল বেরুলো অঞ্জলির মার চোখে।

আমি ভারি অপ্রতিভ হলাম, ভারি খারাপ লাগতে লাগল। ভাড়ার কথাটা না পাড়াই ভালোছিল। হঠাৎ অঞ্জলির মা বললেন, 'অঞ্জু, চা দিলিনে প্রবীরকে?'

বললাম, 'না না চা থাক।'

অঞ্জলির মা স্নিগ্ধ বাৎসল্যে বললেন, 'থাকবে কেন, খাও একটু। শুধু চা-ই তো। এখানে নয় অঞ্জলি, পাশের ঘরে, তোদের পড়বার ঘরে নিয়ে দে। এখানে কত ওষুধ পথ্যের গন্ধ, এখানে কি মানুষ কিছু খেতে পারে। নিঃশ্বাস নেওয়াই শক্ত—'

পাশের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই মিন্টু রিন্টুরা বেরিয়ে এল। বইয়ে খাতায় ছোট টেবিল টুকু ভরে রয়েছে। আমার লাইব্রেরী থেকে চেয়ে নেওয়া খান কয়েক বইও রয়েছে তার মধ্যে। টলস্টয়ের মোটা 'ওয়ার এণ্ড পীস' খানার ভিতর থেকে নীল রঙের একটি ট্রামের টিকিট উঁকি দিচ্ছে। বইটা অনেকদিন এনেছে অঞ্জলি, এখনো শেষ করতে পারেনি।

একটু বাদে চায়ের কাপ এনে অঞ্জলি টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে একটু সরে দাঁড়াল, এই মাত্র উনুনের কাছ থেকে উঠে এসেছে। আগুনের আঁচ লেগেছে মুখে, কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আট-পৌরে কালোপেড়ে শাড়িখানার আঁচল কোমরে জড়ানো। আঙুলগুলিতে

ঈষৎ হলুদের ছোপ। তবু এই বেশে ভারি সুন্দর মনে হোল অঞ্জলিকে, ভারি নতুন লাগল। আর কোন মেয়ের সুগৌর ছোট কপালে ঘামের বিন্দুও যে এমন নয়নাভিরাম হয়, তা আমি এই প্রথম লক্ষ্য করলাম।

অঞ্জলি বলল, 'চা নাও তোমার।'

বললাম, 'নিচ্ছি। শোন, এমন ক'রে পালিয়ে রয়েছ কেন।'

অঞ্জলি মৃদু হাসল, 'পালিয়ে আর থাকতে পারলাম কই।'

বললাম, 'পারবেও না। শুনেছ বোধহয় কথাটা আমি সবাইকেই বলেছি।'

অঞ্জলি বলল, 'না বলাই বোধহয় ভালো ছিল। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে—'

বললাম, 'সামান্য ব্যাপার। জীবনের এত বড় ব্যাপারটাকে তুমি সামান্য ব্যাপার বল?'

অঞ্জলি নীরবে মুখ নীচু করল, মনে হোল সে মুখ স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত। কোন কিছুকে সামান্য বললেই কি তা সামান্য হয়ে যায়।

হঠাৎ কি হোল। ওর হাতখানা নিজের মুঠির মধ্যে চেপে ধরলাম আমি। মুহূর্তকাল সেই হাত আমার হাতের মধ্যে ঘামতে লাগল, কাঁপতে লাগল।

অঞ্জলি বলল, 'ছাড়।'

বললাম, 'না, ছাড়ব না। সকলের কাছে বলেছি, তোমার কাছে আরও স্পষ্ট ক'রে ঘোষণা ক'রতে চাই। সব দ্বিধা, সঙ্কোচ, সংশয়ের আজ শেষ হয়ে যাক।' বলে আমার হাতের হীরার আংটিটি অঞ্জলির আঙুলে জোর ক'রে পরিয়ে দিলাম। বললাম, 'তিন বছর আগে জন্মদিনে মা দিয়েছিলেন এই আংটি। আমি দিলাম তোমাকে। তিনি বেঁচে থাকলে আপত্তি করতেন না, আশীর্বাদ করতেন।'

অঞ্জলি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর বলল, 'কিন্তু এ আংটি আমি পরব কি করে।'

বললাম, 'আমি তো দিলাম, তুমি কি ক'রে পরবে তুমিই জানো।'

অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন ঘুম হোল না। ছাতে এসে আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশে চাঁদ নেই, তারাও নেই, শ্রাবণের ঘন মেঘ থম থম করছে। এমন দিনে, এমন জায়গায়, এমন ভাবে কারো হাতে আংটি পরাব, তা কোন দিন ভাবতে পারিনি। এই দিনটি সম্বন্ধে কত কল্পনাই ছিল। কিন্তু যা সমস্ত কল্পনাকে ছড়িয়ে যায় তাই তো বড় রোমান্স।

পিসীমা সেদিন পূজোর ঘরে যেতে যেতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর হাতের আংটিটা কি হোলরে ছোটন? বউদি যে আংটিটা দিয়েছিলেন তোকে? মরা মানুষের হাতের চিহ্ন হারিয়ে ফেললি না কি?'

বললাম, 'না হারায়নি, পিসীমা। সে আংটি ঠিক জায়গায় আছে।'

পিসীমা একটুকাল আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বুঝেছি।'

আমি ভাবলাম আরো অনেক কথা শুনতে হবে, আরো অনেক কথার জবাব দিতে হবে, কিন্তু পিসীমা আর কিছুই বললেন না, নিঃশব্দে ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কেবল দরজা দেওয়ার শব্দটা অন্য দিনের চাইতে বড় শোনাল।

অদ্ভুত লজ্জা অঞ্জলির। প্রকাশ্যে আংটিটা সে কিছুতেই পরবে না। সে আংটি পরে কলেজে যাবে না, কারো সামনে বেরোবে না। তা না বেরোক। সেই আংটি ওর আঙুলে নাই বা রইল, তার অস্তিত্ব আছে ওর মনে, তার আভা ওর সমস্ত মুখ থেকে ফুটে বেরুচ্ছে। তা ও লুকবে কি করে।

তবু এক এক সময় সে আংটি পরত অঞ্জলি, যখন পার্কের কোণে, লেকের ধারে, কি রেস্তোঁরায় নিভৃত চায়ের টেবিলে, আমরা মুখোমুখি বসতাম। ওর হাতের আঙুলে হীরা জ্বলত, আমার মনে জ্বলত হীরকময়ী।

ক্রমে আমাদের বাড়ির সবাই ব্যাপারটা মেনে নিলেন। এখন আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়েটা হয়ে গেলেই হয়। আমার একগুয়েমির ফল একদিন আমি ভোগ করবই। কিন্তু পরিচিত মহল এই নিয়ে গল্পে গুজবে দিনের পর দিন যে ভাবে মুখর হয়ে উঠেছে, একমাত্র বিয়ের মিষ্টিতেই সে মুখ এখন বন্ধ করা সম্ভব।

এবার অঞ্জলির মার শরীরটা একটু সুস্থ হলেই হয়।

একদিন বিয়ে সম্বন্ধেও অঞ্জলির সঙ্গে আলাপ হোল, আমি বললাম, 'যাই বল, হিন্দু বিয়ে বড় বিদঘুটে, মেয়েলি আচারের জ্বালায় অস্থির হতে হয়। আমার ইচ্ছে বিয়েটা আচার-সম্মত না হয়ে আইন সম্মত হোক।'

অঞ্জলি বলল, 'না। আইনটা নিতান্তই আইন। কিন্তু মেয়েলি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যে কাব্যটুকু আছে তা তোমার আদালতের আইনে কোথায় পাবে ?

আমি প্রতিবাদ করলাম না। এই আচার-অনুষ্ঠানের কাব্যে মেয়েদের যে কি আসক্তি তা তো জানি। বিয়ের নিমন্ত্রণ পেলে বউদি কোনটি প্রত্যাখ্যান করেন না। বিয়ের কথা শুনলেই তাঁর মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বিয়েটা যেন আর কারো নয় তাঁরই। মনে হয় এই সোলার মুকুট আর ছাঁদনা তলার লোভ দেখিয়ে মেয়েদের বহুবার বিয়েতে রাজি করান যায়।

বউদির সঙ্গে সন্ধি ক'রে বাজী রেখে সেদিন সন্ধ্যার পর তাঁকে নিয়ে

তাস খেলতে বসেছি, হঠাৎ মিণ্টু এসে দোরের সামনে দাঁড়াল, 'প্রবীরদা!'

তাস থেকে চোখ না তুলেই বললাম, 'কি।'

'শিগগির আসুন। আমাদের ঘরে পুলিশ এসেছে। বাবাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে।'

তাস ফেলে ফিরে তাকালাম। মিণ্টুর চোখ ছল ছল করছে। বছর দশ এগার হবে বয়স। কোঁকড়ানো চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়েছে। ওর দিদির মুখের আদল আছে ওর সঙ্গে। মিণ্টু আবার বলল, 'শিগগির আসুন প্রবীরদা, বাবাকে ওরা ধরে নিতে এসেছে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে বললাম, 'ভয় নেই, চল আমি আসছি।'

জন দুই কনস্টেবলের সঙ্গে সাব-ইনস্পেক্টর নিশানাথ নন্দী দোরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার সঙ্গে মুখচেনা ছিল এর আগে, আমাকে দেখে মৃদু হাসলেন, 'এই যে আসুন। ঠিকানা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। কালীমোহনবাবু কি কিছু হন আপনাদের?'

হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল 'ওরা আমাদের ভাড়াটে।' সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরের অঞ্জলি আর তার মার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হোল। অঞ্জলির বাবা অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন।

নিশানাথবাবু বললেন, 'তাই বলুন।'

বললাম, 'কালীমোহনবাবুর নামে চার্জটা কি।'

নিশানাথবাবু বললেন, 'যা হয়ে থাকে আর কি, মিস্‌এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অব্ মানি, চীটিং, কন্‌স্পিরেসি সব আছে। মনিব বিশ্বাস ক'রে ক্যাশ রাখতে দিয়েছিলেন, সেই টাকা নিজে ভেঙে খেয়েছেন। আরো দু'তিন জন সেলসম্যানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে সরিয়েছেন ডজন ডজন

সাবানের বাক্স, ক্যাস্টর অয়েলের শিশি, গোটা তিরিশেক ফাউন্টেন পেনের হদিস মিলছেনা। আরো কি কি গেছে, ক্রমে বেরোবে।'

বললাম, 'কিন্তু কালীমোহনবাবুই যে আছেন এর মধ্যে তার প্রমাণ—'

নিশানাথবাবু বললেন, 'প্রমাণ না পাওয়া গেলে তো গোলমাল মিটেই যায়, প্রবীরবাবু। আমরাও তাই চাই। কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকমই মনে হচ্ছে। এই দুটো বুঝি এদের ঘর ?'

বাড়ির ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান, ড্রাইভার, সবাই এসে ভিড় করছিল। আমি তাদের ধমকে সরিয়ে দিলাম।

নিশানাথবাবু বললেন, হ্যাঁ, ওরা যাক। কিন্তু আপনি থাকুন আমাদের সঙ্গে। আপনার অমূল্য সময়, কিন্তু আপনাকে একটু কষ্ট দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

নিশানাথবাবু হেসে তাঁর সিগারেট কেস খুলে ধরলেন। আমি সিগারেট না নিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম, 'বেশ, আমি আছি এখানে। কতক্ষণ লাগবে আপনাদের ?'

নিশানাথবাবু বললেন, 'কতক্ষণ আর, বড় জোর আধঘণ্টা। এই পাড়ায় আরো দুটো কেস আছে মশাই তাও সেরে যেতে হবে। দুর্ভোগ কি কম। দিনের পর দিন অপরাধীর সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে খাবার ঘুমোবার আর জো থাকবে না।'

কথা রাখলেন নিশানাথবাবু, আধঘণ্টার বেশি সময় নিলেন না। কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যে দুই ঘরের সমস্ত বাক্স প্যাটরা বিছানাপত্র উল্টে তছনছ ক'রে ছাড়লেন।

সার্চলিস্টে অবশ্য বেশি জিনিসের নাম উঠল না। অপহৃত কোন মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেল না। ন্যাশনাল স্টোর্সের ছাপমারা কয়েকটা খালি প্যাকেট, গোটা দুই খাতা, তেলের শিশি, টুকিটাকি আরো দুই

একটা জিনিস নিশানাথবাবু কুড়িয়ে নিলেন, বললেন, 'মালপত্র তো এখানে থাকবার কথা নয়, প্রবীরবাবু। সেগুলি যথাস্থানেই গেছে। আপাতত মালিক মহোদয়কে যে ঠিক মত পেয়েছি এই পরম ভাগ্য।'

তারপর কালীমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে তহবিল তছরুফের দায়ে এ্যারেস্ট করলাম, চক্রবর্তী মশাই। ভদ্রলোকের ছেলে, বেশ তো চাকরি বাকরি ক'রে খাচ্ছিলেন—এ সব মতি গতি কেন হোল বলুন তো।'

বললাম, 'ওঁকে এ্যারেস্ট করবার মত যথেষ্ট কারণ কি পেয়েছেন আপনারা ?'

নিশানাথবাবু হাসলেন, 'একি বলছেন, প্রবীরবাবু! যথেষ্ট কারণ না পেলে পুলিশের বাবার সাধ্য আছে কারো গায়ে হাত দেয় ?'

অঞ্জলি পাশের ঘরে এসে অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরল, 'বাবাকে ছাড়িয়ে আন। উনি নিশ্চয়ই একাজ করেন নি, করতে পারে না। ওঁকে বাচাও।'

মনে মনে ক্ষোভ ছিল অঞ্জলি যেন একটু বেশি চাপা স্বভাবের মেয়ে। ওর মধ্যে বয়সোচিত উচ্ছ্বলতা নেই। ও উদ্বেল হয়ে দুই কূল ভাসিয়ে নিতে জানে না। আজ দেখলাম জানে। কিন্তু আমি ভেসে যেতে পারলাম না। যে টেবিলের ধারে আমি ওকে সেদিন আংটি পরিয়ে দিয়েছিলাম, সেই খানেই আজ ও আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু আশ্চর্য, উনিশ বছরের সুন্দরী মেয়ের আলিঙ্গনে কোন মাদকতা নেই, এ যেন কোন তরুণী নারীর বাহু ডোর নয়, দুশ্ছেদ্য লোহার বেড়ী মাত্র।

আস্তে আস্তে ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'এত অধীর হচ্ছ কেন অঞ্জু ? এমন ব্যাকুলতা তোমাকে মানায় না। তুমি যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছ। পৃথিবীর রীতি নীতি আইন কানুন তোমার না বুঝবার

কথা নয়। তোমার বাবা যদি দোষ না ক'রে থাকেন, তাঁকে কেউ কিছু করতে পারবে না। আর যদি দোষী বলেই গণ্য হন, তা হলে law will take its own course.'

অঞ্জলি বলল, 'law ?'

বললাম, 'হ্যাঁ, আইন আদালত। বিয়ের ব্যাপারে সেটা avoid করা গেলেও এক্ষেত্রে যাবে বলে মনে হয় না, যাওয়া উচিত নয়।'

অঞ্জলি বলল, 'যা অনুচিত তা তোমাকে আমি করতে বলব না। কিন্তু বাবা যেন বিনা দোষে কষ্ট না পান সেটা দেখ।'

দাদা অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে সব শুনে বললেন, 'বড় অন্যায় করেছ, প্রবীর। ব্যাপারটা এখানেই মিটিয়ে ফেলা উচিত ছিল। শত হলেও ওঁরা আমাদের ভাড়াটে। তা ছাড়া—'

দাদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলেন না। কিন্তু তাঁর অনুক্ত অপমানটুকু আমার মনে তীরের মত এসে বিঁধল।

বললাম, 'তা ছাড়া ওঁরা আমাদের যাই হন না কেন, এ ব্যাপারে unfair means আমি আপনাকে নিতে দেব না, দাদা। আমার বিশ্বাস কালীমোহনবাবু নিরপরাধ, আর যদি অপরাধ করে থাকেন তিনি নিশ্চয়ই তার শাস্তি ভোগ করবেন।'

দাদা বললেন, 'বেশ। ওদের ব্যাপারে আমি আর কোন কথা বলব না, সেই ভালো, তোমার যা ইচ্ছা হয় কর। হ্যাঁ, একটা কথা। পিসীমার গুরুদেব সেদিন বুঝি পঞ্জিকা দেখেছিলেন। এই মাসের শেষ দিকে নাকি বিয়ের ভালো দিন আছে।'

বুঝতে পারলাম unfair means কথাটার জ্বালা দাদা এখনও ভুলতে পারেন নি। আমাদের business সম্বন্ধে আমি অনেক দিন অনেক রকম সমালোচনা করেছি, দাদা তেমন চটেন নি; বরং বেশির ভাগই

হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'হাতেকলমে কাজ-কর্ম কর, ব্যবসার রহস্য তখন বুঝবে।'

কিন্তু আজ এত চট্‌লেন কেন।

তাঁর কথার জবাবে বললাম, 'পিসীমার গুরুদেবকে বলবেন আপাতত তাঁর পাঁজি দেখবার দরকার নেই।'

বিয়ের দিন স্থগিত রইল; কালীমোহনবাবুর মামলার দিন পড়তে লাগল। হাজত থেকে তিন দিন পরেই তিনি Bail পেয়েছিলেন, আমিই জামিন হয়েছিলাম তাঁর। ভালো একজন উকিল বন্ধুকেও ঠিক ক'রে দিয়েছিলাম তাঁর জন্য। তবু কিছু হোল না। এক বছর জেল হোল কালীমোহনবাবুর। উকিল বন্ধু বললেন, শাস্তিটা আরও বেশিই হোত, কমাবার কৃতিত্বটা তাঁর।

অঞ্জলিকে বললাম, 'appeal করতে চাও তো বল, ভালো ব্যারিস্টারের কাছে নিয়ে গেলে পয়েণ্ট নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে।'

কিন্তু অঞ্জলি মাথা নাড়ল, বলল, 'না। appeal আর করব না। টাকা পয়সা সব ফুরিয়েছে। তা ছাড়া বাবা আমার কাছে অপরাধ স্বীকার করেছেন। আচ্ছা বাবা তো এমন ছিলেন না। কেন এমন হলেন বলতে পার?'

বললাম, 'প্রশ্নটা criminology-র।'

অঞ্জলি বলল, 'কেবল criminology-তেই এর সমাধান আছে? আচ্ছা দিও তো দু'চারখানা বই।' বলবার ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ ছিল, ধারাল শ্লেষ ছিল অঞ্জলির। তা আমাকে বিঁধল।

বললাম, 'তুমি কি বলতে চাও তা জানি। ন্যাশনাল স্টোর্সের মালিকেরা তাদের কর্মচারীদের ওপর অনেক দুর্ব্যবহার করেছেন। সময়

মত মাইনে মেলেনি, সামান্য কারণে মাইনে কাটা গেছে, ওভারটাইম খাটিয়ে পয়সা দেননি. তাঁদের আরো অনেক দোষ ত্রুটি মামলার সময় বেরিয়েছে। কিন্তু তার প্রতিকারের অন্য উপায় ছিল। তিনিও চাকরি ছেড়ে চলে আসতে পারতেন। ন্যাশনাল স্টোর্সই তো একমাত্র স্টোর নয়।'

অঞ্জলি একটু হাসল, 'আমিও তাই বলি। ন্যাশনাল স্টোর্সই একমাত্র নয়।'

আমি চটে উঠে বললাম, 'তাই বলে তোমার বাবার তহবিল তছরুপের সমর্থন করতে চাও?'

অঞ্জলি মাথা নাড়ল, 'না, আমি শুধু তাঁর অপকার্যের কারণ খুঁজতে চাই।'

বললাম, 'কারণ আমি আরও কিছু কিছু খুঁজে দেখেছি। আমাদের সরকার মশাই কড়া তাগিদ দিচ্ছিলেন, বিশু ডাক্তারের বিলের ভয়ে তোমার বাবা ওপথ মাড়াতে পারতেন না, বন্ধু স্বজন সবাই তাঁর মহাজন হয়ে উঠেছিলেন, এমন অনেক কারণ আরো হয়ত আছে। কিন্তু তবু ভারতবর্ষের দরিদ্র ব্রাহ্মণ তেঁতুল পাতা খেয়ে বেঁচেছে, তাও না জুটলে উপবাস করে মরেছে, কিন্তু চুরি করেনি।'

অঞ্জলি বলল, 'আজ কেন করে তাই তো জানতে চাইছি।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'যাকগে। যা হবার হয়েছে। তুমি কদিন ধরে কলেজে যাচ্ছ না কেন? পার্সেন্টেজ থাকবে? পরীক্ষা তো এলো।'

অঞ্জলি একটু হাসল, 'হ্যাঁ, পরীক্ষা এসেছে।'

বললাম, 'কিন্তু preparation নিশ্চয়ই তেমন হয়নি। ইংরেজীটা নিয়ে সন্ধ্যার দিকে এসো আমার কাছে। যদিও আই-এস-সি

পর্যন্তই ইংরেজী বিদ্যা, তবু কিছু কিছু সাহায্য বোধ হয় করতে পারব তোমাকে।

অঞ্জলি একটু হাসল, 'তুমি শুধু জ্ঞানবানই নও, বিনয়বানও, কিন্তু এবার আমি appear করব না ঠিক করেছি।'

বললাম, 'করলে পারতে, এখনও সময় ছিল।'

অঞ্জলি বলল, 'সময় আর কই। একটা চাকরি বাকরি খুঁজতে হবে না এবার ?'

একটু কাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বললাম, 'চাকরি ? তুমি চাকরি করবে ?'

অঞ্জলি বলল, 'না করলে চলবে কি করে বল। হাবুলের তো কিছু হোলই না। মিণ্টু রিণ্টুকে তো খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করতে হবে। তা ছাড়া মামলার ধার দেনাও যথেষ্ট হয়েছে।'

বললাম, 'কিন্তু তার জন্য তোমাকে চাকরিতে নামতে হবে ? আমার যা আছে তাতে কি কুলোবে না ?'

অঞ্জলি একটু চুপ করে রইল, তারপর আমার দিকে না তাকিয়ে চোখ নীচু করে বলল, 'তাতে শুধু দুজনের কুলোবে। তা ছাড়া তুমি তো অনেক দিয়েছ।'

এতক্ষণ কেবল কাটা কাটা কথা বলেছে অঞ্জলি, কেবল তর্ক করেছে, কিন্তু এবার সব কিছুর ওপর ও যেন মধু ছিটিয়ে দিল। শুধু দুজনের।' দুজন কথাটার মধ্যে এত মাধুর্য। সব জ্বালা সব দ্বেষ সেই মন্ত্রের ছোঁয়ায় অমৃত হয়ে ওঠে। আর আমি ওকে অনেক দিয়েছি। তা দিয়েছি, একথা স্বীকার করব। কিন্তু অঞ্জলি দিয়েছে কি ? দিয়েছে বইকি। ও না দিলে আমি ওকে দিলেম কোত্থেকে। ওর অস্তিত্বই তো একটা পরম দান।

এই মাস কয়েকের বিপর্যয়ে দুঃখ ধাঁধায় অঞ্জলি বেশ একটু বদলেছে। ওর কথার ধরণ পালটে গেছে, ঘুরে গেছে ভাবনার মোড়।

নানা ধরণের চিন্তা ওর মাথায় ঢুকেছে। তা ঢুকুক। আমি তো তাই চাই। ওর ধার বাড়ুক, তীব্রতা বাড়ুক, আত্মপ্রত্যয় বাড়ুক, তা বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে বৈচিত্র্য ; এবার সত্যিই যেন হীরার দ্যুতি ফুটে বেরুচ্ছে ওর ভিতর থেকে। এ গর্ব আমার, আমি গোড়াতেই ধরতে পেরেছিলাম ও কি। তাই তো বউদির মনোনীতারা আমার মনঃপূতা হয় নি।

দিন কয়েক বাদে অঞ্জলিকে বললাম, 'অনেক দিন একসঙ্গে বেড়াইনে। চল আজ একটু ঘুরে আসি।'

অঞ্জলি একটু কি ইতস্ততঃ করল, তারপর বলল, 'আচ্ছা চল।'

এখানে ওখানে ঘুরলাম, হগ মার্কেট থেকে ফুল কিনলাম, বই কিনলাম, তারপর ঠিক করলাম লম্বা ড্রাইভ দেব ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত। বহুকাল ওদিকে যাওয়া হয় না। কিন্তু তার আগে চায়ের পিপাসা মেটান দরকার। কেবল তৃষ্ণা নয়, ক্ষুধাও পেয়েছে।

দুজনে মিলে বহুদিন বাদে চায়ের কাপ নিয়ে মুখোমুখি বসলাম নিভৃতে। সূর্যাস্তের রঙ পড়েছে অঞ্জলির গালে, চুলে, কপালে। কেটলি থেকে আমার কাপে চা ঢেলে দিচ্ছিল অঞ্জলি, হঠাৎ ওর আঙুলের দিকে আমার চোখ পড়ল। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ল অনেকদিন ধরে দেখিনে ওর হাতের সেই আংটিটি। চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে বললাম, 'তোমার সেই আংটিটি কি হোল? বহুদিন পর না, আজ প'রে এলেই পারতে।'

অঞ্জলি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বলি বলি করেও বলা হয় নি তোমাকে। আংটিটি আমার কাছে এখন নেই।'

আমি একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইলাম, তারপর হেসে বললাম, 'আমি এই রকমই আন্দাজ করেছিলাম। বিক্রি করে দিয়েছ তো?'

অঞ্জলি এক মুহূর্ত আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, 'বিক্রি নয়, বাঁধা রেখেছি। আবার ফিরিয়ে আনা যাবে।'

বললাম, 'ওই একই কথা। না আনলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আংটিটি আমার মার স্মৃতি-চিহ্ন।'

অঞ্জলি বলল, 'আমার বাবাকে রক্ষা করার কাজে সেটা বাঁধা পড়েছে। মার বাক্সে সামান্য যা গয়না ছিল, তিনি বের করে দিলেন, মিণ্টু, রিণ্টু পর্যন্ত খুলে দিল তাদের হাতের একগাছা করে চুড়ি। সব এক ফুঁয়ে শেষ হোল। সকলের চোখ পড়ল আমার হাতের আংটির দিকে। আমার নিজের চোখেও ভারি বিসদৃশ লাগছিল।'

বললাম, 'বেশ করেছ।'

কিন্তু মনের মধ্যে ব্যাপারটা কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। অঞ্জলির তস্কর বাপের জন্য আমার পুণ্যবতী মায়ের অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন বাঁধা পড়েছে—একথা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। পিসীমার সেই তিরস্কার মনে পড়ল 'আংটিটা তুই কি হারিয়ে ফেললি, ছোটন?'

কাপের চা বিস্বাদ লাগল। সেটাকে একটু সরিয়ে রেখে বললাম, 'কোন দোকানে বাঁধা রেখেছ। রসিদটা দিয়ো আমাকে।'

কিন্তু অঞ্জলি ঠিকানা দিল না, বলল, 'ভেবনা, ও আংটি আমিই ফিরিয়ে আনব।'

আমার কোন সংশয় রইল না আংটিটি অঞ্জলি বেচেই দিয়েছে। তা দিক, কিন্তু আমাকে বললেই তো পারত। আমাকে বললে ও আংটি বেচবার প্রয়োজনই হোত না। অঞ্জলির মা বোনেদের গয়নাও রক্ষা পেত। আমি অনেকবার টাকার কথা বলেছি অঞ্জলিকে। কিন্তু প্রতিবার অঞ্জলি মাথা নেড়েছে। বলেছে দরকার হলে নেব। ওদের

অনেক দরকার আমি পরোক্ষভাবে মিটিয়েছি। কিন্তু সরাসরি টাকা চাইতে অঞ্জলির সম্ভ্রমে বেধেছে।

আশ্চর্য এই নিম্ন মধ্যবিত্ত মন, আর আশ্চর্যতর এদের সম্ভ্রমবোধ। এদের কিসে যে মান যায়, কিসে যে থাকে তা আমার কাছে এক হেঁয়ালী। জাত দিয়েছে, মান দেয়নি, হৃদয় দিয়েছে, মাথা দেয়নি। আর আমাদের অফিসের কেরানীরা ঠিক উল্টো। তারা মস্তিষ্ক বিক্রয় করেছে হৃদয় দেয়নি। ওরা হাতে কলম পেষে, দাঁতে পেষে দাঁত, মাথায় চক্রান্তের পর চক্রান্ত আঁটে। যেন আমি কিছু বুঝিনে। যেন আমি জানিনে ওদের মুরোদ। ওদের শঠতা, বঞ্চনা, চাটুবাদ, পরিবাদ, ঈর্ষা, অসূয়া, নাড়ী-নক্ষত্র যেন কিছু জানতে বাকি আছে আমার। ওরা ভাবে এসব ওদের কৌশল, ট্যাকটিকস্ ছাড়া কিছু নয়। সংগ্রামের অস্ত্র মাত্র। জীবনের পক্ষে সংগ্রাম, ধনিকের বিপক্ষে সংগ্রাম। দুই সংগ্রামে ওদের এক বাজী, এক পণ—জীবন নয়, চরিত্র। চরিত্র যদি যায় ওরা কি করে বাঁচবে, কি নিয়ে বাঁচবে। চরিত্র যদি হারায় তা কি আর ওরা ফিরে পাবে? অঞ্জলির এই হীরার আংটির মত সে চরিত্র বাঁধা রাখাও যা, বিক্রি করাও তাই। একই কথা।

অঞ্জলি বলল, 'কি হোল তোমার, চা খেলেনা যে!'

বললাম, 'খুব খেয়েছি, ওঠ এবার, যাওয়া যাক।'

অঞ্জলি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল, কি বুঝল সেই জানে—কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অদ্ভুত একটু হাসল অঞ্জলি, বলল, 'আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু তোমার আংটি আমি সত্যিই উদ্ধার করে আনব।'

'তোমার' কথাটা খট করে কানে বিঁধল। বললাম, 'আমার? ও কি শুধু আমারই আংটি, অঞ্জু? ও কি আমাদের নয়?

অঞ্জলি বলল, 'আমিও তো তাই ভেবেছিলাম।'

বললাম, 'আরও একটু তলিয়ে ভেবে দেখ, তা হলেই বুঝবে।'

দুজনে ফের উঠলুম এসে মোটরে। ডায়মণ্ডহারবারে আর সেদিন যাওয়া হোল না। বাষ্পীয় পোত সামুদ্রিক ঝড়ে টলমল করছে। এ সময় আশ্রয় পেলে ভালোই হোত ; কিন্তু আশ্রয় কি চাইলেই মেলে ?

কয়েকদিন বাদে অঞ্জলি একদিন বলল, 'দেখ, আমি একটা চাকরি পেয়ে গেছি।'

রাগ চেপে বললাম, 'বেশ তো, কোথায়।'

অঞ্জলি বলল, 'টেলিফোন অফিসে।'

বললাম, 'আর কোন অফিসে পছন্দ মত কাজ কি জুটল না ?'

অঞ্জলি বলল, 'জুটল আর কই। টিচারী অবশ্য পাই। কিন্তু আণ্ডার গ্রাজুয়েট টিচারদের মাইনে তোমার খাস বেয়ারার চাইতে অনেক কম।'

বললাম, 'কিন্তু টেলিফোন অপারেটারের কাজ ছাড়াও আণ্ডার গ্রাজুয়েট লেডী টিচারের একটি বিকল্প চাকরি আমার কাছে আছে।'

অঞ্জলি একটু হাসল. 'তা জানি। খাস বেয়ারা নয়, একেবারে খাস সেক্রেটারীগিরি। কি বল, তাই না ?'

বললাম, 'তাই যদি হয়, ক্ষতিটা কি ? টেলিফোন অপারেটারের চাইতে আশাকরি, কিছু বেশি মাইনেই দিতে পারব।'

অঞ্জলি বলল, 'তা তুমি পার। কিন্তু আমি পারিনে।'

বললাম, 'কেন, না পারবার কি আছে ?'

অঞ্জলি অদ্ভুত একটু হাসল, 'রাণীগিরি ক'রে ক'রে যার হৃদয় পাকল, সে তোমার অধীনে কেরানীগিরি ক'রে হাত পাকাবে, একথা বলতে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল।'

আমি আর কিছু বললাম না। ইচ্ছা করলে পারি। ইচ্ছা করলে এখনই ওকে জোর ক'রে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে আসতে পারি আমার

তে-তলার ঘরে। ইচ্ছা করলে বুকে চেপে ধ'রে বলতে পারি, 'না, কিছুতেই যেতে দেবনা তোমাকে।'

কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে। হৃদয়ের কাঙালপনা আর নয়। এই একটি সাধারণ মেয়ের জন্য আমার সমস্ত দম্ভ, সমস্ত পৌরুষ নিঃশেষ ক'রে কি একেবারে দেউলে হ'তে হবে? দেউলে হবার আর বাকি আছে কি? তাছাড়া দেউলে হ'লে ওর কাছে আমি এখন যা পাচ্ছি তার চেয়ে বেশি কিছু কি পাব? মেয়েরা যদি একবার টের পায় পুরুষ সর্বস্ব বিকিয়ে বসেছে, তারা তাকে সর্বস্ব দেয না, সর্বস্বের চাইতে অনেক কম দেয়, যা দেয় তা না দেওয়ার নামান্তর। নারীর কাছে ভিক্ষা ক'রে স্নেহ মেলে, প্রেম মেলে না, আর জোর ক'রে? জোর করেও তাই। জোর করে শ্রদ্ধা মেলে, ভয় মেলে, হৃদয় মেলে না। আশ্চর্য মেয়েদের হৃদয়। কিসে যে ওদের হৃদয়ের কপাট খোলে, কিসে যে বন্ধ হয়, তা টের পাওয়ার জো নেই। কিন্তু এ হয়ত নিছক কাব্য। হৃদয় আবার কি, ভালোবাসা আবার নতুন একটি কি বস্তু। অবসর কালের সাহচর্য, শ্রদ্ধা আর ভয় তারই রাসায়নিক ফল। তা ছাড়া আবার কি। দেখি তো দাদা বউদিকে, বউদি দাদাকে ভয় করেন, তাই বলে কি রসালাপ করেন না? আমিও তাই চাই। ওকে জয় করতে চাই। ওর ভয় পেলেই আমার চলবে, ভালোবাসার প্রয়োজন নেই। আমি জোর করব। কিন্তু জোর তো যে কোন মুহূর্তে করতে পারি। তার আগে দেখিই না ওর মনের জোর। ও নিজে ফিরে আসবে। ও নিজেই নতজানু হবে আমার কাছে। টেলিফোন অপারেটারের চাকরি যে কি সুখের তা তো আমি আর না শুনেছি তা নয়। দু'দিনেই ওকে ফিরে আসতে হবে।

কিন্তু দু'দিনের বদলে দু'মাস কাটল অঞ্জলি ছেড়ে এলনা ফোন অপারেটারের চাকরি। অথচ চাকরি করতে যে কষ্ট হচ্ছে তা তো নিজের চোখেই দেখি। দেখি ওর চোখে মুখে, ওর শারীরিক ক্লান্তিতে। ডিউটির ঠিক নেই। কখনো সকালে, কখনও দুপুরে, কখনো রাত্রে। ওর কলেজী সজ্জাও দেখেছি, এখনও দেখি, খুব যে বদলেছে তা নয়। প্রায় ঠিকই আছে সেই শাড়ি পরার ঢঙ, চুল বাঁধার ভঙ্গি। মাঝে মাঝে আমার দেওয়া দামী শাড়ি পরেও বের হয়। তখন বুঝতে বাকী থাকে না ওর আটপৌরে শাড়ির টানাটানি পড়েছে। রাতের ডিউটি দিয়ে ও যখন সকালে ফেরে তখন এক একদিন চেয়ে দেখি। ওর সেই আয়ত সুন্দর চোখ কোটরে ঢুকেছে, চোখের কোলে কালি। যেন নৈশ অভিসার থেকে ফিরে এল। হঠাৎ বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজের কাছে নিজে লজ্জা পাই। ওর দ্বিতীয় প্রেমিক কেউ যদি থাকে সে কোনো পুরুষ নয়, সে ওর প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনকে প্রেমিক বলব, না স্বামী বলব? প্রয়োজনকে ওকি ভালেবেসেছে, প্রয়োজনাতীতের দিকেই কি ওর চোখ নেই, নেই সমস্ত মন পড়ে? আমি সেই প্রয়োজনাতীত। প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত। আমি পেয়েছি ও পায়নি, আমার কাছে ওকে আসতেই হবে।

মাঝে মাঝে ডিউটি দিয়ে ও একা আসে না। ওর সঙ্গে আসে আরো দু'চারটি ক'রে মেয়ে। আমি তাদের দিকে তাকাইনে। তাকাবার যোগ্য নয় তারা। ওদের দিকে তাকালে চোখ পীড়িত হয় আমার। কিন্তু শুধু চোখ নয়, কিছুদিন বাদে কানও পীড়িত হ'তে সুরু করল। অঞ্জলির সেই কুরূপা সঙ্গিনীর দল কেবল ওর সঙ্গেই আসে না, ওর ঘরে বসে জটলা পাকায়, আলোচনা করে, তর্ক করে,

রাজনীতির দলবাদ আর মতবাদে একতলাটা মুখর হয়ে ওঠে। অঞ্জলি আজকাল আর আমার কাছে বই নিতে আসে না, বই দেয় ওর সঙ্গিনীরা। অঞ্জলি জানেনা ওসব বই আমা'র কাছেও আছে, ওসব আমিও পড়ে দেখেছি। হয়তো অঞ্জলির সঙ্গিনীদের চাইতে আরো ভালো ক'রেই পড়েছি, কিন্তু অঞ্জলিরা তা বিশ্বাস করবে না। ওদের বইয়ের প্রতিটি অক্ষরকে মেনে নিতে না পারলে ওদের বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব নয়। ওরা জানে না অক্ষর পরিচয়ে বিদ্যার কেবল সুরু, অক্ষর পরিচয়ে সমস্ত বিদ্যা সীমাবদ্ধ নয়।

দাদা ফের ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। বললেন, 'ভেবেছিলাম, একতলার ভাড়াটের সম্বন্ধে আমি আর কোন কথা বলব না। ওটা তোমারই পোর্টফেলিও। কিন্তু আমার কথা বলবার প্রয়োজন হয়েছে।'

হেসে বললাম, 'বলুন আমার পোর্টফোলিও হলেও প্রাইম মিনিষ্টারের উপদেশ নির্দেশ সর্বদাই বাঞ্ছনীয়।'

দাদা বললেন, ঠাট্টার কথা নয়। একতলায় যে সব কাণ্ড হচ্ছে, তাতে ওদের এবার তুলে দেওয়া দরকার। সহজে না যায় আইনের সাহায্য নিতে হবে।'

বললাম, 'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আইন আদালত করাটা কি ভালো দেখাবে? তা ছাড়া আমি তো তার কিছু প্রয়োজন দেখছিনে। অঞ্জলি চাকরি করছে, এই তো আপনার আপত্তি?

দাদা বললেন, 'সে চাকরিও আবার যে সে নয়, দিন নেই, রাত নেই—'

দাদার অভিযোগের ভঙ্গিতে আমি হাসলাম: 'কিন্তু রাত্রে যদি অঞ্জলিরা ঘরে বসে থাকে আমাদের কাজ কর্ম অচল হয়ে যে, প্রয়োজনটা তো আমাদেরই।'

দাদা বললেন, 'আর আমাদের বাড়ির একতলাতেই ওদের চিরকালের জন্য রেখে দেওয়া? সেটাও প্রয়োজন?'

বললাম, 'সে সম্বন্ধে আমি ভাবছি। কিন্তু একতলাতেই কি ওরা চিরকাল থাকবে? না, আমরাই রাখতে পারব?'

দাদা একটু হাসলেন, 'ও।'

তারপর ফের গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু অঞ্জলি কেবল টেলিফোন অফিসে চাকার করছে বলে নয়, কেবল কতকগুলি বাজে ধরনের মেয়ে ওদের ঘরে দিনরাত গুজ গুজ করছে বলেই নয়, আমার আরো আপত্তি আছে। জানো ওদের পড়বার ঘরটা ওরা একটা গ্লাস ওয়ার্কসের জনতিনেক ছোকরাকে সাবলেট করেছে? তাদের সঙ্গে কোন মেয়ে ছেলে নেই, তারা নিজেরাই কখনো ঘরের সামনে কখনো ঘরের মধ্যে রান্না ক'রে খাচ্ছে? ঘরের কিছু আর থাকবে নাকি? তা ছাড়া এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। এই সব সোমত্ত বয়সের ছেলেরা—'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'গ্লাস ওয়ার্কস? সেটা আবার কি? সেখানকার লোকেরা এখানে কেন আসবে?'

দাদা বললেন, কেন আসবে আমিও তো তাই জিজ্ঞাসা করি।'

বললাম, 'তাদের আনলে কে? অঞ্জলির সঙ্গে ওদের পরিচয়ই বা কি ক'রে হোল?

দাদা একটু হাসলেন, 'একেবারেই চোখ বুজে আছ। কোন খোঁজ রাখনা। ভালো ক'রে খোঁজ নিয়ে দেখ।'

একটু চোখ বুজেই ছিলাম। বুজে নয়, ফিরিয়ে ছিলাম চোখ। অফিসের কতকগুলি জরুরী কাজ পড়েছে। বেতন বৃদ্ধির আবেদন করেছে কেরাণীরা। এদিকে আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শক্তি পিকচার্সের ডিরেক্টার বন্ধু মনোতোষ হাজার পঞ্চাশেক টাকা ধার

নিয়ে তা জলে দিয়েছে। দু'একদিন সাদরে স্যুটিং দেখাতে নিয়ে গেছে তার ষ্টুডিওতে। ভোজ্য পানীয়ে আপ্যায়িত করেছে, অযাচিত ভাবে আলাপ করিয়ে দিয়েছে নবোদিতা নক্ষত্রদের সঙ্গে; এখন সব বন্ধ। আর পাত্তা নেই মনোতোষের। সিকিউরিটি যা সামান্য ছিল তাতে টাকাটার অর্ধেকও কভার করে না। আরও কতকগুলি ব্যাড্ ইনভেষ্টমেণ্ট হয়ে গেছে। আর এক সহপাঠী বন্ধু অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে ডিপজিট নিয়েছিলেন হাজার দশেক টাকা, তিনি না বলে কয়ে তালা বন্ধ করেছেন। দুনিযায় কাউকে আর বিশ্বাস করবার জো রইল না। দাদা কিছু জেনেছেন, কিছু জানেন নি। কিন্তু আমি ঘাবড়াইনি। ভিতরে বাইরে সব দিকেই আমি টাল সামলাতে পারব। সে মনের জোর আমার আছে।

কিন্তু অঞ্জলিদের পড়ার ঘর সাবলেট করার খবরটা এর পর আর না নিলেই নয়। চাকরকে দিয়ে আমার তে-তলার লাইব্রেরী ঘরে ডেকে পাঠালাম অঞ্জলিকে। একটু বাদেই অবশ্য অঞ্জলি এল, একটু হেসে বলল, 'কি বলছ।'

অনেকদিন পরে যেন দেখলাম অঞ্জলিকে। ওর চেহারা খারাপ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য দেখতে খারাপ হয়নি। নাকি এতদিন না দেখার রঙে আমিও ওকে নতুন ক'রে দেখলাম। আমার নিজের মনের রহস্যে ভাবলাম ওর রূপ ?

বললাম, 'বোসো। কথা কি কেবল আমিই বলব ? তোমার নিজের কিছু বলবার নেই ?'

আশ্চর্য ! একি কাতরতা মনে। আমি ওকে ধমক দেওয়ার জন্য ডেকেছি, ওর কাছে কৈফিয়ৎ নেওয়ার জন্য ডেকেছি, কিন্তু আমার স্বরে সেই রূঢ়তা ফুটছে কই।

অঞ্জলি ফের একটু হাসল, 'বলবার অনেক কথা সত্যিই জমেছে। কিন্তু সময় নেই যে, অফিসে বেরুচ্ছিলাম।'

এখনও হাসলে ওকে চমৎকার দেখায়, ওর গলার স্বর আমার কানে এখনও স্বরযন্ত্রের মত বাজে। বললাল, 'অফিসে বেরুচ্ছ, তাতো বেশ-বাস দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। তবু বোসো। না হয় দু'চার মিনিট লেটই হবে।'

অঞ্জলি সামনের চেয়ারটায় বসে বলল, 'অফিসটা পরস্মৈপদী বলেই এত ঔদার্য আর যদি নিজের হোত?'

কথার সঙ্গে হাসি মেশাল অঞ্জলি, তারপর বলল, 'অবশ্য তুমি খুব লিনিয়াণ্ট আমি জানি।'

বললাম, 'জানো?'

অঞ্জলি মনোরম ভঙ্গিতে ঘাড় কাৎ ক'রে বলল, 'হ্যাঁ।'

বললাম, 'তাই জেনেই বুঝি এইসব করতে সাহস পাচ্ছ?'

অঞ্জলির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, বলল, 'কোন্ সব?'

কিন্তু আমি মুখে হাসি টেনে বললাম, 'এই ধর আমাদের না বলে কয়ে আমাদেরই ঘর গ্লাস ওয়ার্কসের মজুরদের সবলেট করা? তা বেশ করেছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে তোমার আলাপ হোল কি ক'রে?'

অঞ্জলি বলল, 'আমার সঙ্গে প্রথম হয়নি, হয়েছে হাবুলের সঙ্গে। ধীরেন বাবু আর গোবিন্দ হাবুলের কলীগ। বয়সে আমার চেয়ে একটু বড় হলেও ওঁরা আমাকে দিদি বলে ডাকেন।'

হেসে বললাম, 'ভালোই তো। সম্পর্ক কি সম্বোধনের ব্যাপারে আমার কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু হাবুলের সহকর্মী তাঁরা হলেন কি করে ঠিক বুঝতে পারলাম না তো? হাবুলও গ্লাস ফ্যাক্টরীতে ঢুকেছে না কি? তুমিই বুঝি ঢুকিয়ে দিয়েছ?'

অঞ্জলি মাথা নাড়ল। না, সে ঢুকায়নি। ঢুকেছে হাবুল নিজেই। ওর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল খুব কমই ছিল। একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল মনে। লেখাপড়া অল্পবয়সেই ছেড়ে দিয়েছে। তা দিক। সকলের তো আর লেখাপড়া হয় না। কিন্তু ওদের সংসারের কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও ওকে দেখেছি পাড়ায় সস্তাব চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে, বিড়ি ফুঁকতে; নিচু শ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে রসালাপ করতে। কালীমোহনবাবু একাই বাজার করতেন, রেশন আনতেন, বরং মিণ্টু, রিণ্টুকে দোকান থেকে ছোট ছোট ব্যাগ বয়ে নিতে দেখেছি, কিন্তু হাবুল কোনদিন কোন কাজে এসে তার বাবার সাহায্য করেনি। কালীমোহনবাবুর মামলার সময়ও এই ছেলেটিকে বিশেষ দেখতে পেতাল না। একদিন বুঝি দুঃখ করেছিলেন ওদের মা, বকাবকি করেছিলেন, তার ফলে কোন এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে কিছুদিনের মত নিরুদ্দেশ হয়েছিল হাবুল। সে হঠাৎ গ্লাস ওয়ার্কসে ভিড়ল কি করে।

অঞ্জলিই বলল কাহিনী। একদিন খেতে এসে অরাতুর মাকে ভাত বেড়ে দিতে দেখে হাবুলের ভারি করুণা হোল, বলল, 'তুমি দাঁড়াতে পারছ না তো দিতে এসেছ কেন? দিদি কোথায়? বিবি বোধ হয় কলেজে গেছেন? ওকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে সবাই মিলে তোমরা ওর মাথাটা খেলে। আর ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে কি হবে বলতে পার?'

হাবুর মা একটু হাসলেন, 'তা তো ঠিকই। কিন্তু অঞ্জু কলেজে যায় নি। অফিসে চাকরী করতে গেছে।'

হাবুল ভাতের গ্রাস মুখে না তুলে বলল, 'চাকরী করতে? চাকরী করে নাকি ও?'

'না করলে এসব খাচ্ছিস কি?'

হাবুল গম্ভীর মুখে ভাত খেয়ে উঠল। ঘরে মাছ নেই বলে সেদিন আর কোন কোন্দল করল না, পরদিনও না। তৃতীয় দিনে এসে বলল, 'আমি গ্লাস ওয়ার্কসে কাজ নিলাম দিদি।'

অঞ্জলি বলল, 'সে কি রে। ও কাজ তুই পারবি কেন।'

হাবুল বলল, 'কেবল, ও কাজ কেন, অনেক কাজই পারি। কেবল তোমাদের ওই লেখাপড়াটাই মাথায় ঢুকল না। বীরেনদা বলে, আর একটু বয়স বাড়লে ঢুকবে। তারও নাকি এমনি হয়েছিল।'

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বীরেনদাটি কে।'

বীরেনদার কাছেই ও কাজ শিখেছে হাবুল। সখ ক'রে এক এক দিন তার সঙ্গে সিগারেটের লোভে তার জোগান দিয়েছে। এখন সেই সখটা কাজে লাগল।

কত মাইনে, ক'ঘণ্টার চাকরি, কি রকম খাটুনি কিছুই অঞ্জলিকে বলেনি হাবুল। সেই স্বভাব, সেই একগুয়ে ভাব সবই প্রায় তেমনি রয়ে গেছে। আগেও সংসারে কোন কাজ করত না, এখনও করে না, আগেও খাওয়ার সময় ছাড়া বাসায় আসত না, এখনও তাই। কেবল একটু পালটেছে। চায়ের দোকানে, বিড়ির দোকানে ওকে এখন আর দেখা যায় না। তা ছাড়া মাস অন্তে কোন মাসে পঞ্চাশ, কোন মাসে ষাট ধ'রে দেয় অঞ্জলির হাতে।

বললাম, 'তা না হয় দিল, কিন্তু এর ভবিষ্যৎ কি? তার চেয়ে আমাকে যদি বলতে—'

কিন্তু কথাটা আমি আর শেষ করলাম না।

অঞ্জলিকে যেদিন চাকরি অফার করেছিলাম সে দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

একটু গম্ভীর হয়ে থেকে বললে, 'আমার বোঝা বুঝির ও যেন কত ধার ধারে। বেকার বসে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তার চেয়ে কিছু একটা করে মন্দ কি। তারপর কাজে যদি একবার আগ্রহ আসে, একাজ ছেড়ে অন্য কাজেও ঢুকতে পারবে '

'তা পারবে। সে তোমরা যা ভালো মনে কর করবে। কিন্তু কোন কারখানায় ঢুকলেই তার লোক এনে নিজেদের সাবলেট করতে হবে, এমন কি কোন কথা আছে ?'

অঞ্জলি বলল, 'তা নেই। কিন্তু বিশ্বাস কর, এ ব্যাপাবে আমার যে খুব মত ছিল তা নয়, কিন্তু হাবুলেব গোয়াতুর্মির কাছে আমি হার মেনেছি। সে বলে ওদের স্থান না দিলে ওরা যাবে কোথায় ? কথাটা ঠিক। যা শুনলাম, তাতে ভারি কষ্টই হোল। এক হিসেবে ওরা আমাদের চেয়েও অসহায়। কাদের বাড়ির এক বাইরের ঘরে থাকত। কোন রসিদ টসিদ কিছু ছিল না' কি যেন কথান্তর হয়েছে বাড়িওয়ালার সঙ্গে, তাবা তুলে দিয়েছে। 'আসলে অন্য ভাড়াটে বসিয়ে বেশী ভাড়া নেবার মতলব।'

বললাম, হুঁ, আর বীরেন, গোবিন্দদের দিদির মতলবটা কি।'

অঞ্জলি একটু হাসল, 'ধরেছ ঠিকই, মতলব যে একটু না আছে তা নয়। হাবুল যখন এনেই ফেলেছে তখন আর করা যাবে কি। ভাবলাম আমাদের নিজেদেরও পয়তাল্লিশ টাকা ভাড়া টানতে কষ্ট হচ্ছে। সংসারের খরচ তো কম নয়, তা ছাড়া ফি মাসেই কিছু না কিছু দেনা শোধ করতে হয়। যে কদিন আছে ভাড়ার খানিকটা যদি হাবুলের বন্ধুরা বেয়ার করে একটু সুবিধাই হয়।'

বললাম, 'যতই ঘুরিয়ে বল, দাদাকে না জানিয়ে ঘরখানা সাবলেট করেছ, কথাটা ঠিকই।'

অঞ্জলি বলল, 'আবার বেঠিকও ধ'রে নিতে পার। ওদের আমরা রিসিট টিসিট তো কিছু দেইনি। সুবিধা হলেই ওরা চলে যাবে। কিংবা অসুবিধা হলেই আমরা তুলে দেব। ট্যাকটিক্‌স্‌টা তো শিখেই নিয়েছি।'

অঞ্জলি একটু হাসল।

বললাম, 'কোন জিনিসই অত তাড়াতাড়ি শেখা যায় না অঞ্জলি, শিখতে সময় লাগে।'

অঞ্জলি উঠে দাঁড়াল, 'অন্য সময় বেশী সময় বসে তোমার কাছ থেকে সব শিখব, এবার উঠি। অফিসের দেরী হয়ে গেল।'

অঞ্জলি চলে গেল।

মন ভারি খারাপ লাগতে লাগল। কিন্তু মনের অস্বাস্থ্যকে আমল দিলে কাজ করা যায় না। অথচ কাজ আমাকে করতেই হবে।

পরদিন একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলাম হাবুলের বন্ধুদের। অঞ্জলির নতুন ভাইদের একটির বয়স বছর বাইশ-তেইশ, এই বয়সেই চোয়াল ভেঙেছে। কালো রোগা লম্বাটে চেহারা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। এরই নাম বোধহয় বীরেন। আর একটি হাবুলেরই বয়সী, কি তার চেয়ে দু'এক বছর বেশী হবে। ফসাপানা খাটো চেহারা। দাঁতে বিড়ি চেপে তোলা উনানে তালপাখার হাওয়া করছে। অত্যন্ত আনইম্‌প্রেসিভ্‌ চেহারা। একবার দেখলে পরের বার মনে থাকে না। নিশ্চিন্ত হলাম। অঞ্জলির ওরা ভাই হবারই যোগ্য। ইদানীং হাবুলকেও প্রায় ওই রকম দেখাচ্ছে।

একথা ঠিক, আর কারো দিকে অঞ্জলির মন আকৃষ্ট হয়নি। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পদে আর কোন পুরুষ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওর সামনে দাঁড়ায় নি। মাঝখানে কোন দ্বিতীয় পুরুষ নেই, আছে শুধু মত, রাজনৈতিক আদর্শ। কিন্তু তার কি এতই জোর যে,

ভালোবাসা তার তাপে শুকিয়ে যায়, প্রেম নির্জীব হয়ে আসে? মতটাই কি মানুষের সব খানি? তার জন্য সব বাদ দিতে হবে—হৃদয়কে পর্যন্ত?

রেলিঙে ভর করে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম; হঠাৎ কাঁধে হাত পড়ল। মুখ ফিরিয়ে দেখি দাদা।

'এত রাত্রেও ঘুমুলনি প্রবীর। হয়েছে কি তোর বল তো?'

অনেকদিন পর যেন স্নেহের স্বর শুনতে পেলাম ওঁর। উৎকণ্ঠিত মুখে ফের দেখতে পেলাম ওঁর স্নেহ। ছেলেবেলায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন দাদা। কত যে আবদার মেনেছেন তার ঠিক নেই।

বললাম 'কি আবার হবে। অমনিই এসে দাঁড়িয়েছি এখানে, ঘুম পাচ্ছিল না।'

দাদা এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন তারপর বললেন, 'আমি সব বুঝি প্রবীর, সব জানি। আমাকে লুকিয়ে কোন লাভ হবে না।'

দাদার গলার স্বর গাঢ়, আর্দ্র। দিনের বেলার সেই রূঢ়তা রুক্ষতার চিহ্নমাত্র নেই। বললাম 'আপনাকে তো কিছুই লুকোইনি দাদা।'

তিনি বললেন 'তা ঠিক, কিছুই লুকোওনি। তুমি সত্যি বলেছ, আজ আমি একটা কথা বলি। পুরুষের জীবনে মেয়েদের ভালবাসাই একমাত্র নয়, প্রথম বয়সে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু বয়স যখন বাড়ে, মন যখন পরিণত হয়, তখন বোঝা যায় নারীর প্রেম হাজার জিনিসের মধ্যে একটি মাত্র। তার ধ্যান-ধারণা, কাজ-কর্ম—তা সে কাজ যেমনই হোক না কেন, যে আদর্শেরই হোক না কেন,—এমনই করে মানুষকে ডুবিয়ে রাখে যে সে হাজার চেষ্টা করলেও শুধু প্রেমে ডুবুডুবু হওয়ার তার সময় থাকে না, প্রবৃত্তি থাকে না। এমন কি নারীর প্রেম না পেলেও তখন বেশ চলে যায়, আমারই কি চলছে না?'

শেষ কথাটি কিন্তু অহঙ্কারের নয়, আক্ষেপের মতই শোনাল।

দাদার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ যে ভালো করে দেখতে পেলাম না, সে একরকম ভালোই হোল। এমন স্বীকৃতি দাদার মুখে এর আগে কোনদিন শুনিনি। দাদা মাঝে মাঝে বউদিকে চোখ রাঙান বটে, কিন্তু শাড়ি, অলঙ্কার, তাঁর সব রকম দাবীই তো দাদা মেটান। না চাইতেই আনেন উপহার, উপঢৌকন, ছেলেমেয়েও তো হয়েছে ওঁদের। তবু একথা কেন তিনি বলছেন, কি করে তিনি বুঝলেন যে, প্রেম ছাড়াই চলেছে তাঁদের। যা চলেছে, সেটা প্রেম নয়। বউদিরও কি এই বক্তব্য? অন্ধকার রাতে ঘুম-ভাঙা বিছানা থেকে উঠে এসে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আমার কাঁধে হাত দিয়ে এই কথাই বলতেন, 'ঠাকুরপো, প্রেম ছাড়াই চলছে আমাদের, প্রেম ছাড়াও চলে।'

মিথ্যা কথা। চলে না—যারা পায়নি, তারা চালিয়ে নেয়। কিন্তু যারা একবার পেয়েছে, তারাই জানে জিনিসটা কি। একবার পেলে তার স্বাদ সারা-জীবন জড়িয়ে থাকে, তার সৌরভ সারাজীবন ছড়িয়ে থাকে। আমি জড়িয়ে গেছি। এ জট আমি খুলতে চাই না।

দাদাকে বললুম, 'আপনি ঘরে যান। আমার জন্য ভাববেন না।'

আশ্চর্য! আজ দাদার জন্যই আমার ভাবনা হচ্ছে, ভারি মমতা হচ্ছে ওঁর ওপর।

ধীরে ধীরে সবাই ফের কাছে এলেন। দাদা, বউদি, পিসীমা, সকলেরই স্নেহ পেলাম আবার। বুঝতে পারলাম এবারের স্নেহ ওঁদের দয়া-সঞ্জাত। যে একদিক থেকে বার বার ঘা খাচ্ছে, আর একদিক থেকে আঘাত তাঁরা তাকে আর করতে চান না। তাছাড়া আমাদের কসবার বাড়িও শেষ হয়ে এসেছে। সেখানে উঠে গেলেই

সব আপদ যাবে। একতলায় যা কাণ্ড হচ্ছে হোক। একখানা ঘর বই তো নয়। আমার জন্য তার ক্ষতি না হয়, ওঁরা স্বীকার করলেনই।

পিসীমা বললেন, 'নতুন বাড়িতে উঠেই কিন্তু নতুন বউ আমি ঘরে আনব। মেয়ে আমি দেখে রেখেছি।'

আমি মনে মনে হাসলাম, মুখে বললাম, 'বেশ তো।'

অঞ্জলিকে ডেকে বললাম কথাটা। 'পিসীমা কি বলছেন জানো? তিনি নতুন বউ নিযে নতুন বাড়ীতে উঠতে চান।'

বহুদিন পরে অঞ্জলির ফের আরক্ত মুখ দেখলাম। অঞ্জলি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ তো।'

পিসীমার কথার পুরো জবাব যেমন আমি দেইনি, আমার কথার পুরো জবাবও তেমনি যে অঞ্জলি দিল না, সে কথা বুঝতে পারলাম।

একটু বাদে অঞ্জলি আমার দিকে মুখ তুলে তাকিযে হাসল, 'কিন্তু পিসীমার নতুন বাড়িতে কি আর আমি উঠতে পারব?'

অঞ্জলির অভিযোগের কারণ ছিল। ওর নাইটডিউটি, ওর স্বাধীন চালচলন নিয়ে পিসীমা অনেক রকম কথা বলেছেন। অঞ্জলির বাবার জেল হওয়ার পর মিণ্টু, রিণ্টুকে পর্যন্ত পিসীমা সন্দেহ করতেন। তারা আমার দুই ভাইপো সন্তু-অন্তুর সঙ্গে ওপরে খেলতে গেলে পিসীমার অস্বস্তির সীমা থাকত না। পাছে কোন জিনিস খোয়া যায়, পাছে অসৎ সংসর্গে খারাপ হয়ে যায অন্তু-সন্তু। আমি অবশ্য তাঁর এই মনোভাব, এ ধরনের আচরণকে প্রশ্রয় দিই নি। তবু মিণ্টু-রিণ্টুকে বারণ করে দিয়েছেন তাদের মা। তিনি নিজেও বড় একটা ওপরে আসতেন না। তাঁর শরীর খানিকটা সেরেছিল, কিন্তু স্বামীর জেল হবার পর থেকে পারতপক্ষে বাইরে আসতেন না, কথা বলতেন না, কারো সঙ্গে।

অঞ্জলিকে বললাম, 'বেশ তো নতুন বাড়িতে পিসীমারাই যাবেন। আমরা এখানেই থাকব, তা হলে তো আর তোমার আপত্তি নেই?

অঞ্জলি মৃদু হাসল, 'কিন্তু আমার আপত্তি কি আর তুমি শুনবে?' অর্থাৎ অঞ্জলি তো আপত্তি করবেই। কিন্তু সে আপত্তি আমাকে জোর করে অগ্রাহ্য করতে হবে। এতদিন জোর না খাটিয়ে আমি কি তাহলে ভুল করেছি? ভালোবাসার যে জোর, তা না খাটাতে পারলে ঠকতে হয়। আমি আর ঠকবো না। কসবায় নতুন বাড়ি যতদিনে শেষ হয় হোক, এই পুরোনো বাড়িতেই আমি নতুন ঘর বাঁধব। তারপর চাকরী থেকে ছাড়িয়ে আনব অঞ্জলিকে। ছাড়াব ওর এই দীন আড়ম্বর বেশ। দৈন্য ওকে মানায় না।

দাদাকে ফের কথাটা বলব বলব ভাবছি। বলব পিসীমার সেই গুরুদেবকেই না হয় ডাকুন, অঞ্জলির যখন আচার অনুষ্ঠানটাই এত পছন্দ, তখন তাঁরই শরণ নেওয়া যাক। কিন্তু এই সময় আর এক কাণ্ড ঘটল। অঞ্জলির সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। ঝগড়ার কারণটা সামান্য। বীরেন আর গোবিন্দরা উনানটা তাদের ঘরের সামনে থেকে একটু প্যাসেজের দিকে সরিয়ে এনে আঁচ দিচ্ছিল, আমাদের সরকার মশাই বাড়িতে ঢুকবার সময় বললেন, 'এখানে উনানে আঁচ দিচ্ছে কে, এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। সারা বাড়িটাই এরা নষ্ট করবার জো করেছে দেখছি।'

বীরেন বলল, 'আমাদের জন্য আলাদা একটু রান্নার জায়গা যদি দেখিয়ে দিতেন সরকার মশাই, তা হলে আর সারা বাড়ি নষ্ট হোত না।'

সরকার মশাই বলেছিলেন, 'ইস, সখ দেখ, দয়া করে থাকতে দিয়েছি, এর পর আবার রান্নার জায়গাও দিতে হবে। রান্নার জায়গা নেই তো হোটেলে খেলেই পার। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সারা বাড়ি নষ্ট করবে তোমরা?"

গোবিন্দ মুখ ভেংচিয়ে বলেছিল, 'ঈস্, ভারি তো দরদ। নষ্ট করি তো করব। আপনার বাবার বাড়ি তো নয়, আর মাগনাও আমরা থাকি না, রীতিমত মাসের পর মাস ভাড়া গুনি।'

সরকার মশাই আর সহ্য করতে পারেন নি। গোবিন্দের গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বলেছিলেন, 'গুনিস তো হারামজাদা তাতে আমার কি। সে ভাড়া কি আমি খাই? তুই আমার বাপ তুলে কথা বলিস, এত বড় স্পর্ধা তোর।'

বলে দ্বিতীয় চড় মারতে উদ্যত হয়েছিলেন সরকার মশাই; কিন্তু গোবিন্দ যীশুখৃষ্টের উপদেশ স্মরণ করে গাল বাড়িয়ে দেয়নি, সরকার মশাই'র হাত মুচড়ে দিয়েছিল।

ব্যাপারটা যখন আমার কানে গেল, আমি অঞ্জলিকে ডেকে বললাম, 'অবশ্য সরকার মশাইরও দোষ আছে। কথাবার্তা একটু ভদ্রভাবে বলা তাঁর উচিত ছিল; মারধর করাটাও ঠিক হয়নি; কিন্তু ওরা থাকলে এ ধরনের গণ্ডগোল আরো হবে। ওদের এবার তুলে দেওয়া দরকার।'

অঞ্জলি বলল, না ওরা এমন কিছু দোষ করেনি যে, ওদের তুলে দিতে হবে। তোমাদেরই উচিত সরকার মশাইকে বরখাস্ত করা।'

আমার আর সহ্য হোল না, বললাম, 'আমাদের কি উচিত না উচিত, তা তোমাকে দেখতে আসতে হবে না অঞ্জলি, তুমি ওদের যেতে বল, ওদের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ আছে।'

'কি অভিযোগ?'

,ওরা সন্ধ্যার পর ছাতে এসে আড্ডা দেয়, আর বিড়ি টানে।'

অঞ্জলি অদ্ভুত একটু হাসল: 'কি করবে বল, তোমার মত দামী সিগারেট তো ওদের নেই, সস্তা বিড়ি টানা ছাড়া ওদের আর গতি কি আছে। আর ছাতে ওরা আড্ডা দিতে যায় না। সারাদিন

ফার্ণেসের সামনে থেকে জ্বলেপুড়ে, কদাচিৎ দু'একদিন একটু হাওয়ায় গিয়ে বসে। তোমার বউদি তখন একটু সরে গেলেই পারেন। ছাতটা তো কেবল দোতলা-তেতলার বাসিন্দাদেরই নয়, একতলার জীবদেরও তাতে একটু-আধটু অধিকার আছে।'

অনেক সময় অনেক বাঁকা কথা বলেছে অঞ্জলি। কিন্তু ওর আজকের বলবার ভঙ্গী এত রূঢ়, এত স্পর্ধিত যে, আমার অত্যন্ত অসহ্য লাগল। তীব্র বিদ্রূপে বললাম, নতুন ধর্মভাইদের ওপর তো তোমার ভারি টান, ভারি দরদ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওদের তুমি যদি না তুলে দাও, আমি তোলার ব্যবস্থা করব।'

অঞ্জলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেশ তো তুমিই কর।'

আমি মুহূর্তকাল স্তব্ধ হ'যে রইলাম। তারপর তার সামনেই সরকার মশাইকে ডেকে বললাম, 'সরকার মশাই, ওই লোকদুটোকে তিন দিনের মধ্যে আমার বাড়ি থেকে তুলে দেবেন।'

অঞ্জলি একটু কাল আমার দিকে তাকিযে রইল। তারপর বলল, 'আচ্ছা। কিন্তু সরকার মশাই যেন নিজের গায়ের জোর খাটাতে না আসেন। তা'হলে হয়তো অশিক্ষিত মজুরদের হাতে ফের অপমানিত হবেন। যা করবার আইন আদালতের সাহায্য নিয়েই তিনি করে যেন।'

বললাম, 'আইন আদালত? তুমি আমাকে আইনের ভয় দেখাচ্ছ অঞ্জলি?'

অঞ্জলি বলল, 'ভয় নয়। তুমি তো আইন আদালতই ভালোবাসো। আচার অনুষ্ঠানের কাছে তো তোমার বিশ্বাস নেই, তাই বলছিলাম।'

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে রইলাম। অঞ্জলি আর দাঁড়ালো না।

অনেকদিন অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে। কিন্তু এত বিদ্বেষ, এত বিতৃষ্ণা কোনদিন বোধ করিনি। অঞ্জলির আজকের কলহের মধ্যে লালিত্য নেই, অভিমান নেই, অনুযোগ নেই, কেবল অপমান আছে। এ অপমান আমি সহ্য করতে পারি না।

খানিক বাদে মনটা শান্ত হলে সরকার মশাইকে অবশ্য আমিই নিষেধ করে দিলাম। বললাম, 'ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখি। হঠাৎ কিছু করবার দরকার নেই আপনার।'

সরকার মশাই মৃদু হেসে জানালেন যে, হঠাৎ তিনি কিছু করবেন না। যা করবার দরকার আমার সুচিন্তিত মতামত নিয়েই করবেন।

দিন কয়েক কাটল। অঞ্জলিকে আমি আর ডাকলাম না। অনেক ডেকেছি, অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। এবার ও নিজে আসুক, নিজের ভুল স্বীকার করুক। ঔদ্ধত্যের জন্য মার্জনা না চায়, লজ্জা প্রকাশ করুক। তার আগে আমি ওকে ক্ষমা করব না।

সেদিন সন্ধ্যার পর অনেক কাল বাদে ফের খুলেছি বইয়ের আলমারি। ভাবছি দর্শন, বিজ্ঞান নয়, কিছু বাঙ্গালা কাব্য পড়ব। হয় বৈষ্ণব পদাবলী, নয় রবীন্দ্রনাথ—বহু দিন কবিতা পড়ি না, ফুল কিনি না, তাকাই না আকাশের দিকে। অথচ ফুল ফুটেছে, কেবল তারা নয়, চাঁদও উঠেছে, কেবল ক্যালেণ্ডারের পাতায় তারিখের বসন্তের আবির্ভাব দেখলাম না, মনের মধ্যেও শুনলাম ফাল্গুনের গুনগুনানি। ওপরের তাক থেকে বই টেনে নিচ্ছি। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। টোকা তো নয়, যেন ভিতরের আর এক রুদ্ধ দরজায় কে যেন ধাক্কা দিয়েছে।

বললাম, 'এস দোর খোলাই আছে।'

কিন্তু দোর খুলে ঢুকলেন আমাদের সরকার মশাই। সহর্ষে বললেন, 'আমাদের আর তুলতে হোল না ছোট বাবু। যারা তুলবার তারাই তুলে নিয়ে যাচ্ছে। একতলায় দেখুন গিয়ে কাণ্ড।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কি হয়েছে একতলায় ?'

সরকার মশাই বললেন, 'কি আবার হবে। লালপাগড়ীতে ছেয়ে গেছে। ঠিক সেবারের মত।'

সেবারের মত আজ আমাকে কেউ ডাকতে এলো না। কিন্তু কৌতূহলী হ'য়ে নিজেই গেলাম। কেবল কি কৌতূহল? বউদি, পিসীমা সবাই রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দেখছেন। আমি তাঁদের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম।

সাব-ইন্সপেক্টর নিশানাথবাবু আজও দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে হেসে বললেন, 'এই যে আপনি আছেন দেখছি। ভালোই হোল।'

বললাম, 'তা তো হোল। কিন্তু ব্যাপারটা কি ?'

গ্লাস ওয়ার্কসের প্রোপ্রাইটার রাধানাথ কুণ্ডুর জামাই শশিপদর মাথায় কারা লোহার ডাণ্ডা মেরেছে। তাঁকে পাঠাতে হয়েছে হাসপাতালে, কুণ্ডুমশাইয়ের সন্দেহ হাবুলদেরই এই কীর্তি। এদের নামেই পুলিশে ডায়েরী করেছেন তাঁরা।'

বললাম, 'কিন্তু এরাই যে, করেছে তার প্রমাণ কি ? এরা কেন করবে ?'

নিশিনাথ বাবু বললেন, 'কেন করবে, আমরাও তো তাই ভাবি। তাঁদের কারখানায় এরা কাজ ক'রে খাচ্ছে এই দুর্দিনে, অন্ন জুটছে তাঁদের দয়ায়। তবে শশিপদবাবু একটু রূঢ়ভাষী সে দোষ তাঁর আছে। কিন্তু যে গরু দুধ দেয়, তার লাথিটাও সয় মশাই। তাই ব'লে—'

তার কথায় বাধা দিয়ে হাবুল রূঢ় ভঙ্গীতে বলল, 'তাই ব'লে কেউ কারো মাথায় বাড়ি মারতে যায় না, আমরাও তা যাই নি। আমরা যা করব ইউনিয়নের মারফৎ করব। শশিপদবাবু মাথায় লোহার ডাণ্ডার ঘা খেল কেন, তা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন গিয়ে। কে আমাদের নীলকণ্ঠের বিধবা বোনের ঘরে ঢুকতে গিয়েছিল? অনর্থক আমাদের ওপর দোষ চাপালেই হোল।'

নিশানাথবাবু কঠিন স্বরে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'চুপ, যা বলবার কোর্টে বলবে। তোমাদের কোন দোষ নেই? গুণ্ডা, বদমাস কোথাকার, তোমরা যে কত গুণী, তা যেন জানতে বাকি আছে আমাদের। এই তো সেদিন প্রবীরবাবুদের সরকারমশাইর হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিয়েছ তিনজনে মিলে। আজ ভোরে বাজারে দেখা, কত দুঃখ করলেন সরকারমশাই। ওঁরা নেহাৎ সদাশয় লোক। তাই তোমাদের দয়া ক'রে থাকতে দিচ্ছেন। কিন্তু কিছুদিন শ্রীঘরে না থাকলে তোমাদের শিক্ষা হবে না।'

অঞ্জলি এগিয়ে এল। বলল, 'কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ ব্যাপারে ওদের কোন দোষ নেই। হাবুলের একরোখা স্বভাবের জন্যই আপনারা ওকে সন্দেহ করছেন।'

নিশানাথবাবু একটু হাসলেন, 'আপনার দৃঢ় বিশ্বাস তো আপনাদের বাবার সম্বন্ধেও ছিল। এবার দেখা যাক কি হয়। ওদের দোষ না থাকলে তো ভালোই।'

খানাতল্লাসীতে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। বিড়ি সিগারেট খাওয়ার জন্য অ্যাম্পিউল ফ্যাক্টরী থেকে কাঁচের তিনটি চমৎকার পাইপ তৈরী করেছিল তিন বন্ধু। নিশানাথবাবু সেগুলি কুড়িয়ে নিলেন, সেই সঙ্গে কিছু লিফ্‌লেট প্যাম্ফ্‌লেটও তাঁর হাতে পড়ল।

নিশানাথবাবু ওদের তিনজনকে এ্যারেষ্ট করে নিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়ার পর হঠাৎ আমার চোখ পড়ল অঞ্জলির ওপর। স্পন্দনহীন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে অঞ্জলি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার বুকের ভিতর ধ্বক ক'রে উঠল। বললাম, 'একটু এ ঘরে এসো অঞ্জলি। ব্যাপারটা ভালো করে শুনি। গতবার যেভুল করেছিলাম, এবার আর তা করব না। এবার নিশানাথবাবু আর কুণ্ডুদের ধরে বিষয়টা গোড়াতেই মিটিয়ে নিতে হবে। শোন কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

অঞ্জলি বলল, 'আমারও কথা আছে। তুমি ওঘরে অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুনি আসছি।'

অঞ্জলিরও কথা আছে। এই বিসদৃশ পরিবেশের মধ্যে কথাটুকু ভারি মিষ্টি লাগল আমার কানে।

একটু বাদে এ ঘরে চলে এল অঞ্জলি। ওর সেই পড়ার ঘর। সেই টেবিল নেই, সেই বইপত্র নেই, কিন্তু ঘরতো ঠিকই আছে, স্মৃতি তো ঠিকই আছে।

আমি কিছু বলবার আগে অঞ্জলি আজও আমার খুব কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল। আজও আমাকে হয়তো তেমনি বিহ্বলভাবে জড়িয়ে ধরবে। বিপদের পর বিপদ যাচ্ছে ওদের, কতক্ষণ আর সয় নার্ভে। ধরে তো ধরুক। আজ আর আমি আড়ষ্ট হয়ে থাকব না। ওর বাবার দুষ্কৃতির জন্য তো আর ও দায়ী নয়। ওর আলিঙ্গন আমি আজ সুস্থ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করব।

কিন্তু অঞ্জলি ঠিক সেদিনের মত দু'হাত দিয়ে আমাকে আজ আর আঁকড়ে ধরল না। মৃদু হেসে বলল, 'তোমার হাতখানা দেখি।'

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

অঞ্জলি ওর হাতের মুঠি খুলে সেই হীরার আংটিটা আমার

অনামিকায় ধীরে ধীরে পরাতে লাগল, শিউরে উঠল গা। অনেক দিন পর ও আমাকে স্পর্শ করেছে। অঞ্জলি বলল, আংটিটি উদ্ধার করে এনেছি। অনেক টাকায় বাঁধা ছিল। একসঙ্গে দিতে পারিনি টাকাটা, কিস্তিতে শোধ দিতে হয়েছে।'

ওর কাণ্ড দেখে অবাক হ'য়ে যাচ্ছিলাম। বললাম, 'এ আংটির দাম অনেক। ফিরিয়ে এনেছ, ভালই করেছ। কিন্তু এ আংটি আমাকে পরাচ্ছ কেন?'

অঞ্জলি অদ্ভুত একটু হাসল। বলল, 'তোমার হাতেই থাক। ফের তো মামলা মোকদ্দমা শুরু হোল। আবার কখন বাঁধা পড়ে, আবার কখন বাঁধা পড়ি, তার ঠিক কি!

বললাম, 'কিন্তু বাঁধা তোমাকে পড়তেই হবে অঞ্জলি। আমি আর এক মুহূর্তও দেরি করব না। হাবুলদের কালই ছাড়িয়ে নিয়ে আসব। কিন্তু তোমাদের আর একতলায় থেকে দরকার নেই। রাঁধা-বাড়া তো এখনও হয়নি তোমাদের। মিণ্টু রিণ্টুকে নিয়ে তোমরা সবাই ওপরেই আজ খাবে। চল আমাদের সেই তেতলার ঘরে যাই।'

চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল অঞ্জলি। যেন প্রবল এক ঝড়ের দোলায় ও স্থির থাকতে পারছে না। কিন্তু আস্তে আস্তে ফের শান্ত হ'ল অঞ্জলি। মাথা নেড়ে ঠিক আগের মতই মৃদু হেসে বলল, 'না, তেতলার ঘরে গিয়ে আর কি করব বল। আমি ও ঘরে গেলে তোমার শুধু জাতই যাবে না, হয়তো ধন প্রাণ নিয়েও টান পড়বে।' গলা তেমনি মিষ্টি অঞ্জলির, কিন্তু কথা মধুর নয়।

বললাম, 'কি বলছ তুমি?'

আমার কথা অঞ্জলির কানে গেল না, ও নিজের কথার জের টেনেই বলে চলল, 'হয়তো বাবার মত এক হাতে চুরি করব, আরেক

মত আর এক হাতে মাথায় লাঠি মেরে বসব। আমার আর গিয়ে কাজ নেই ওখানে।'

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অঞ্জলির দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলাম। তার পর তীক্ষ্ণতর স্বরে বললাম, 'সেই ভালো।'

পুণর্ভবা

'বিমল সংস্কৃতি-কেন্দ্রে'র কর্ম-পরিষদের মিটিং শেষ হলো ন'টায় কেন্দ্রের পাঠভবন আছে, ত্রৈমাসিক মুখপত্র আছে, এবার একটি নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আলোচনা চলছিল। স্থির হ'ল আগামী সপ্তাহে এ সম্বন্ধে সদস্যদের একটি সাধারণ সভা ডাকা হবে। অবশ্য কর্ম-পরিষদের সিদ্ধান্তই যে সবাই গ্রহণ করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ পর্যন্ত তাই হয়ে এসেছে। কর্ম-পরিষদের প্রায় সমস্ত প্রস্তাবই তাঁরা সমর্থন করেছেন আর পরিষদ পালন করেছে সুকৃতির ইচ্ছাকে। তার নিষ্ঠা আর কর্মনৈপুণ্য সভ্যদের উৎসাহ জুগিয়েছে। নিজেদের শৈথিল্যের জন্য লজ্জিত হয়েছেন তাঁরা। সুকৃতিই এই চক্রের প্রাণ-কেন্দ্র। নৈশ-বিদ্যালয়ের প্রস্তাবটি ওরই।

স্বরাজ প্রেসের স্বত্বাধিকারী প্রৌঢ় যতীশ রায় বললেন, 'কিন্তু মা, এক সঙ্গে অনেকগুলি কাজের ভার নেওয়া কি ঠিক? তার চেয়ে একটি কাজও যদি আমরা ভালো করে করতে পারি তাতে কেন্দ্রের ভিত্তি শক্ত হবে।'

কিন্তু সুকৃতি কিছু বলবার আগে কেন্দ্রের সম্পাদক শেখর সোম আপত্তি জানাল, 'একটি কাজের সঙ্গে আর একটি কাজ যে জড়ানো যতীশবাবু। ভিত যদি বলতে হয়, বিদ্যালয়কেই বলা উচিত। সাধারণের মধ্যে যদি আক্ষরিকতা না বাড়ে, শিক্ষা না ছড়ায় তাহলে আমাদের পাঠ-ভবন টিকবে কি করে? বই পড়বে কে?'

সুকৃতি সোৎসাহে বলল, 'আমিও ঠিক একই কথাই বলতে চাইছিলাম।'

বলেই লজ্জিতভাবে চোখ নামাল সুকৃতি। তার মনে হলো ঘরের আরো অনেকগুলি চোখ যেন বিশেষভাবে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

পাড়ার গঙ্গামণি গার্লস হাইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস মিসেস্ নন্দী মৃদু হাসলেন, 'সত্যি শেখরবাবু, অন্য একজনের মুখের কথা কেড়ে নেওয়ার অভ্যাস ক্রমেই যেন বাড়ছে আপনার।'

শেখর স্থির দৃষ্টিতে মিসেস্ নন্দীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'এখানে আমরা যারা রয়েছি, তাদের আদর্শ তো মোটামুটি এক। তাই একজনের সঙ্গে আর একজনের কথার মিল হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?'

মিসেস্ নন্দী ফের একটু হাসল, 'তা সত্যি। সংসারে কিছুতেই আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়।'

হাইকোর্টের প্রবীণ উকিল প্রিয়নাথ বাঁড়ুয্যে কিছুক্ষণ ধ'রে উঠি উঠি করছিলেন, এবার উঠে দাঁড়ালেন, 'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই মিসেস্ নন্দী, রাত বাড়ছে। বেশ তো, শেখর আর সুকৃতির যদি উৎসাহ থাকে, নাইট্ স্কুল চলবে। বলতে গেলে ওরাই তো সব চালাচ্ছে। দলের মধ্য সবচেয়ে active তো ওরাই।'

মিসেস্ নন্দী কথাটার অনুবাদ করে বললেন, 'হ্যাঁ ওরাই সবচেয়ে সক্রিয়।'

সদস্যরা বাইরের দিকে পা বাড়ালেন। যতীশবাবু বললেন, 'কই শেখর, তুমি যাবে না ?'

শেখর তখন আলমারীর পাল্লা খুলে কি একটা বই খুঁজছে, বলল, 'আপনারা এগোন, আমি একটু বাদে যাচ্ছি।'

মিসেস্ নন্দী যতীশবাবুর দিকে আর একবার অর্থপূর্ণভাবে তাকালেন। তারপর সুকৃতির দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা আমরা তাহলে চলি সুকৃতি। মৈত্র মশাইর শরীর কি খুবই খারাপ? নিচে আজ একেবারেই নামলেন না।'

সুকৃতি বলল, 'হ্যা ওঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না। আপনার কি তাঁর সঙ্গে কোন কথা আছে অনিমাদি?'

হেড মিস্ট্রেস্ বললেন, 'ভেবেছিলাম, আমাদের স্কুল সম্বন্ধে একটু—আচ্ছা, সে আর একদিন হবে। আজ আর ওঁকে disturb করব না।'

সকলের জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেলে শেখর বই খোঁজা বন্ধ রেখে সুকৃতির পাশে এসে দাঁড়াল। সুকৃতি জানলার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। একতলার এই বৈঠকখানা ঘর থেকেও ছোট একফালি আকাশ চোখে পড়ে। সেখানে কয়েকটি নক্ষত্র জ্বল জ্বল করছে।

শেখর একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'কি ভাবছ?'

সুকৃতি বাইরের দিকে তাকিয়েই মৃদুস্বরে বলল, 'কি আবার ভাবব।'

শেখর বলল, 'না, আর ভাববার কিছু নেই। আমি হৃষীকেশ বাবুকে সব বলেছি।'

সুকৃতি চমকে উঠে মুখ ফেরাল, 'বলেছ? কেন বলতে গেলে?'

শেখর বলল, 'একদিন তো বলতেই হতো সুকৃতি। আঘাত তো দিতেই হতো; কিন্তু আমি ভাবিনি এত আঘাত তিনি পাবেন। ভেবেছিলাম ওঁর র‍্যাশনাল, যুক্তিপন্থী মন বিষয়টিকে খুব সহজভাবে নিতে পারবে। কিন্তু তা হল না।'

সুকৃতি শেখরের কথায় কান না দিয়ে অধীরভাবে বলে উঠল, 'ও, সেইজন্যই তিনি নিচে নামলেন না মিটিং-এ এলেন না; সেইজন্যই

অমন ক'রে বিকেল থেকে শুয়ে রয়েছেন। কারো সঙ্গে কোন কথা বলছেন না। কেন, কেন তুমি বলতে গেলে, কেন্দ্রের কাজ নিয়ে আমি বেশতো ছিলাম, আমি তো বেশ থাকতে পারতাম—'

শেখর বলল, 'কিন্তু আমি পারতাম না সুকৃতি। কেন্দ্রের কাজের সঙ্গে আমার আরো অনেক জিনিস চাই। তোমারও তা দরকার, আমি জানি। শুধু মুখ ফুটে তুমি বলতে পারছ না। লজ্জা সংকোচ আর সংস্কার তোমার পথ আটকে ধরছে। কিন্তু আমি কোন বাধা মানব না, তোমাকেও কোন বাধা মানতে দেব না।'

শেখর ওর হাত ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুকৃতি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বল, 'না আজ নয়, আজ তুমি যাও।'

বলে সুকৃতি নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দোতলার সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলে শেখর আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ির চাকর হরিপদ সশব্দে সদর দরজা বন্ধ করতে করতে মুখ মুচকে একটু হাসল।

ওপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল সুকৃতি। পাশের ঘর থেকে হেমলতা বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমার শ্বশুর তোমায় ডাকছেন।'

সুকৃতি চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল। করিডরে আলো নাই। বালবটা ফিউজ হয়ে গেছে আজও বদলানো হয়নি। অন্ধকারে শাশুড়ীর মুখ দেখতে পেল না সুকৃতি, কিন্তু তাঁর গলা বড় নীরস, বড় রুক্ষ লাগল কানে। হেমলতা কখনো ডাকেন মা, কখনো ডাকেন সুকু। কিন্তু আজ তাঁর মুখে কোন সম্বোধনই নেই। সম্ভাষণে শুধু শাসন আর তিরস্কার ফুটে বেরুচ্ছে। বুকের মধ্যে কিসের একটা খোঁচা লাগল সুকৃতির। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আমি নিজেই যেতাম মা, বাবা কি এখনো শুয়ে আছেন?'

হেমলতা রূঢ়স্বরে বললেন, 'থাক থাক, ওসব ডাক তুমি আর মুখে এন না সুকৃতি। আমি সইতে পারছিনে।'

বলে হঠাৎ সরে গেলেন হেমলতা। সুকৃতি লক্ষ্য করল তিনি শ্বশুরের ঘরে গেলেন না। ডান দিকে ঘুরে পশ্চিমের বারান্দায় রেলিং-এর ধারে দাঁড়ালেন। সুকৃতি নিঃশ্বাস চেপে ধীরে ধীরে শোয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

খাটের ওপর বালিশে ভর ক'রে হাতের তেলোয় মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়েছিলেন হৃষীকেশ মৈত্র। সামনে রবীন্দ্রনাথের 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' খানা খোলা। কিন্তু বেশ বোঝা যায়, বইয়ে তাঁর মন নেই। মনঃসংযোগের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় নিজের ওপরই তিনি বিরক্ত হয়ে উঠেছেন।

সুকৃতি কাছে এসে দাঁড়িয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'এখন কেমন বোধ করছেন বাবা?'

হৃষীকেশ পুত্রবধূর দিকে চোখ তুলে তাকালেন। সারাদিনের কাজ-কর্মের পর বেশ একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল সুকৃতিকে। তন্বী গৌরাঙ্গী এই সুন্দরী মেয়েটিকে তিনি নিজে দেখে ছেলের জন্য পছন্দ করে এনেছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন, 'বাজার থেকে তুমি যা আন, তাই খারাপ বেরোয়। তরিতরকারি, কাপড়-চোপড, আসবাবপত্র যা কেন, তাতেই ঠকো। কিন্তু সুকৃতির বেলায় এমন জিতলে কি করে! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি যখন মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে এসেছ, সে নিশ্চই কালোকুচ্ছিৎ, কানা না হয় খোঁড়া। কিন্তু দিদিকে নিয়ে তোমার পছন্দ করা মেয়ে যখন যাচাই করতে গেলুম, অবাক হয়ে দেখলুম তার সব আছে, দুটি চোখ, একটি নাক, দু'খানা হাত দুটি পা—।'

হৃষীকেশ হেসে বলেছিলেন, 'তুমি আর তোমার দিদি বুঝি শুধু ওই-ই দেখে এসেছ?'

হেমলতা বলেছিলেন, 'না গো না। সব দেখে এসেছি। চুল খুলে হাঁটিয়ে, হাসিয়ে সবরকম ক'রে দেখেছি। তোমার ভরসায় বসে ছিলুম ভাবছ নাকি? কিন্তু যাই বল, এতদিনে তোমার বিদ্যাবুদ্ধির ওপর আমার বিশ্বাস এল। দিদি তো হিংসায় বাঁচে না। নন্তু, ঘণ্টুর বউ এ মেয়ের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। অন্যের কথা বলে কি হবে, তোমাদের নিজেদের বংশেও এমন সুন্দরী বউ আর আসেনি। নিজেই না হয় কুচ্ছিৎ, কিন্তু শাশুড়ী খুড়শাশুড়ীর ফটোও তো দেখেছি।'

হৃষীকেশ হেসে বলেছিল, 'থাক থাক, তোমার আর বিনয় করতে হবে না। কিন্তু একটা কথা। জিতেন মজুমদার আমার চেয়েও গরীব। মার্চেণ্ট অফিসের সামান্য কেরাণী, শাখা সিঁদুর ছাড়া কিছুই দিতে থুতে পারবে না; তা ছাড়া ওরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সম্বন্ধ করলে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতে পারব তো? এ সব ব্যাপারে তোমার দাদা যা গোঁড়া!'

হেমলতা অবাক হয়ে থেকে বলেছিলেন, 'ওমা তাই নাকি।' একথা আগে বলনি কেন? এতদূর এগিয়ে—আহা মেয়েটির চেহারা আমার চোখে লেগে রয়েছে—ওরা তাহলে রাঢ়ী—'

হৃষীকেশ স্ত্রীকে ভরসা দিয়ে বলেছিলেন, 'হলই বা রাঢ়ী তবু তো ব্রাহ্মণ। তোমার ছেলের যা মতিগতি তাতে শ্রেণী তো ভালো, একেবারে জাত ডিঙিয়ে যেতে পারে। তারচেয়ে আমি বলি কি—'

হৃষীকেশ যা বলেছিলেন তাই হ'ল। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বিমলও দেখে এল সুকৃতিকে। এতদিন তার ঘোর অমত ছিল বিয়েতে। এবার শোনা গেল মার অসুবিধার কথা ভেবে এ সম্বন্ধে সে বিবেচনা করতে রাজী হয়েছে।

সুকৃতি আবার ডাকল, 'কি ভাবছেন বাবা? শরীর কি খুব খারাপ লাগছে?'

হৃষীকেশ একটু চমকে উঠে বললেন, 'না মা শরীর বেশ ভালোই আছে আমার।'

'তবে?'

কিন্তু এই ছোট্ট প্রশ্নটিও সুকৃতি উচ্চারণ করতে পারল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হৃষীকেশ ফের একবার তাকালেন ওর দিকে। অন্য দিনের মত আজও পরনে ফিতে পেড়ে সাদা খোলের সাধারণ মিলের শাড়ী, গায়ে সাদা ব্লাউজ। গায়ে সরু এক ছড়া হার, হাতে দু' গাছি কাঁকন। বিমলের মৃত্যুর পর এই সামান্য ভূষণ সুকৃতি প্রথমে রাখতে রাজী হয়নি। সাদা থান পরেছিল, অলঙ্কারের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না গায়ে। সব যখন শূন্য হয়ে গেল, জীবনের সব সাধ আহ্লাদ যখন ঘুচল, তখন আর বাইরের সজ্জায়, বাইরের রঙে কি হবে। অন্তরের নিঃস্বতা অকিঞ্চিৎ বহির্বেশে ধরা পড়ুক। ছদ্মবেশে কাজ কি!

কিন্তু হৃষীকেশ আর হেমলতাই ওর সেই যোগিনী মূর্তি সহ্য করতে পারলেন না। শাশুড়ী বললেন, 'তোমার এই রুক্ষ চেহারার দিকে তাকালে আমার বাড়ি ছেড়ে পালাতে ইচ্ছা হয়।'

ওদের একান্ত অনুরোধেই বেশ বদলাতে বাধ্য হ'ল সুকৃতি। পুত্রের মৃত্যুর পর হৃষীকেশ ওর বধূত্ব ঘুচিয়ে ওকে ঠিক মেয়ের মত করে রাখলেন। শ্বশুরবাড়িতেও মাথার আঁচল খসে পড়ল সুকৃতির। সুচিক্কণ ঘন কালো চুলের রাশের ভিতর দিয়ে সাদা সিঁথি ফের দেখা দিল।

হৃষীকেশ বললেন, 'আজ থেকে আমার কাছে তুমি মা গায়ত্রী তাই।'

গায়ত্রী হৃষীকেশের একমাত্র মেয়ে। ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে বাপের বাড়ি। লঘু চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। দাদার মৃত্যুর শোক অল্প দিনেই সে ভুলেছে! হৈ-চৈ, হাসি ঠাট্টায় বউদিকে ও ভুলিয়ে দিতে চায়।

শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্য বাপের বাড়িতে গিয়ে প্রথমদিকেও বেশি দিন থাকতে পারেনি সুকৃতি। দু'দিন যেতে না যেতেই হৃষীকেশ গিয়ে তাকে নিয়ে এসেছেন। জিতেনবাবুকে বলেছেন, 'বেয়াই, তোমার অনেক ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু আমার বাড়ি শূন্য। সুকৃতি যদি আমার কাছে না থাকে আমি টিকব কি করে?'

মাণিকতলা থেকে শ্যামবাজার,—এমন কিছু দূরের পথ নয়। তবু বাপের বাড়িতে খুব কম যাওয়া হয় সুকৃতির বিমল সংস্কৃতি-কেন্দ্রের কাজ বাড়বার পর যাওয়ার আর সময়ই হয় না।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে সুকৃতি বলল, 'সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। এবার আপনার খাবার দিই গিয়ে।'

হৃষীকেশ শক্ত হয়ে উঠে বসলেন, 'না খাবার একটু পরে দিয়ো। কয়েকটি কথা বলবার জন্যই তোমাকে ডেকেছি। বসো।'

সুকৃতি খাটের একেবারে উত্তর প্রান্তে সরে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু হৃষীকেশ বললেন, 'না, আমার কাছে এসে বসো।'

সুকৃতি এগিয়ে এলে হৃষীকেশ তার পিঠের ওপর সস্নেহে আলগোছে ডান হাতখানা রাখলেন। সুকৃতির সর্বাঙ্গ যেন একবার কেঁপে উঠল।

হৃষীকেশ শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আমি সব শুনেছি মা। শেখর আমাকে সব বলেছে।'

সুকৃতি একবার ভাবল প্রতিবাদ করে। কিন্তু গলা দিয়ে তার স্বর বেরুল না।

হৃষীকেশ আবার বললেন, 'হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি। অবশ্য শেখরের কাছ থেকে শোনার আগে আরো অনেক কাণাঘুসা আমার কানে এসেছিল কিছু কিছু আমি লক্ষ্যও করছিলাম। কিন্তু তোমাদের মুখ থেকে শোনার আগে আমি কিছু বলব না, এও মনে মনে স্থির ছিল আমার।'

সুকৃতি এবারও কোন কথা বলতে পারল না।

হৃষীকেশ একটু থেমে ফের বলতে লাগলেন, 'কিন্তু স্থির থাকতে পারলাম না। তোমার কাছে গোপন করব না মা, তা ছাড়া গোপন এতক্ষণে নেইও, শেখরের কথা শুনে আমার মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিল। দু' বছর আগে বিমলকে যেদিন ওরা ছোরা মেরেছিল, ঠিক সেই দিনের মত অবস্থা হয়েছিল আমার। মনে হল, আর একখানা ছোরা ফের যেন আমার বুকে এসে বিঁধছে।'

সুকৃতি অস্ফুট কাতর স্বরে বলল, 'ওর কথায় আপনি কান দেবেন না বাবা। ওকে আপনি সংস্কৃতি-থেকে সরে যেতে বলুন।'

হৃষীকেশ একটু ম্লান হাসলেন, 'প্রথমে প্রায় সেই রকমই বলেছিলাম। এই চুয়ান্ন বছর বয়স হল আমার। জীবনে এত ধৈর্যহীন হয়েছি বলে মনে পড়ে না। ছেলের মৃত্যুতেও এত বিচলিত হইনি। এখন সেকথা ভেবে নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। সংস্কারকে জয় করা, নিজের অধিকারবোধ ত্যাগ করা তো সহজ নয় মা। অথচ শেখরের প্রস্তাবের চেয়ে সহজ আর স্বাভাবিক আর কি ছিল?'

সুকৃতি ক্ষীণ প্রতিবাদ করল, 'স্বাভাবিক?'

হৃষীকেশ বললেন, 'নিশ্চয়ই, শেখর উচ্চশিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান ছেলে। এই সংস্কৃতি-কেন্দ্রের পরিচালনায় তার যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। তুমিও শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, ভালোমন্দ বিচারের

ক্ষমতা তোমার আছে। সব জেনে শুনে পরস্পরকে তোমরা ভালোবেসেছ, পরস্পরের গুণগ্রাহী হয়েছ। তোমাদের বিয়েতে—' কথাটা একটু যেন গলায় আটকালো হৃষীকেশের কিন্তু পরক্ষণেই পরিষ্কার স্বরে বললেন, 'বাধা দেবে কে? আমি বিমলের মাকে এতক্ষণ এই কথাই বুঝিয়ে বলছিলাম। অল্পশিক্ষিতা গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে। সেকেলে আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে। তাই ওর সংস্কারে যদি বেধে থাকে, মমত্ববোধে যদি কিছু আঘাত লেগে থাকে, তার জন্য তুমি কিছু মনে কোরো না।'

সুকৃতি কি বলবে ভেবে পেল না। এর চেয়ে হৃষীকেশ যদি তাকে বাধা দিতেন, নিন্দা করতেন, তিরস্কার করতেন, সুকৃতি প্রতিবাদ করতে নানা যুক্তিতর্কে শ্বশুরের তিরস্কারের জবাব দিতে পারত। কিন্তু তা হ'ল না। হৃষীকেশ তাকে সম্মতিই দিলেন, কিন্তু সেই দানের মধ্যে নিজের আহত হৃদয়ের বেদনার্ত অনুভূতিকে সঞ্চারিত না করে পারলেন না। স্ত্রীর যে অন্ধ সংস্কার আর অযৌক্তিক মমত্ববোধের জন্য লজ্জা জানালেন হৃষীকেশ, সেই সংস্কার আর মমত্ববোধ থেকে তিনিও যে সম্পূর্ণ মুক্ত নন তাতো সুকৃতির কাছে গোপন রইল না।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হলে সুকৃতি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাদের দুজনকে যে বড় ঘরখানা দেওয়া হয়েছিল বিমলের মৃত্যুর পর সে ঘর সুকৃতি ছেড়ে দিয়েছে। যে ঘরে দুজন ছিল সে ঘরে একজনের থাকা দুঃসহ। তার বদলে পুব-দক্ষিণ কোণের সবচেয়ে ছোট ঘরখানা নিজের জন্য বেছে নিয়েছে সুকৃতি। খাট, টেবিল, চেয়ার, আলনা সব সেই বড় ঘরেই রয়ে গেছে। নিজের জন্য সাধারণ সস্তা একখানা তক্তপোষ। মাদুরের ওপর সুকৃতি

সাদা চাদর বিছিয়ে নিয়েছে। ও-ঘর থেকে আর কিছুই সে নিয়ে আসেনি, এনেছে বিমলের ছোট একখানা ফটো। বৃহদায়তনের ফটো বিমলের পছন্দ ছিল না। সুকৃতিও এ ফটোকে এনলার্জ করায় নি। তাদের দুজনের সেই ঘর এখন তালাবন্ধ পড়ে থাকে। ছেলেপুলে নিয়ে গায়ত্রী আর প্রভাস যখন আসে এ বাড়িতে, তখন তাদের জন্য ঘরখানা খুলে দেওয়া হয়।

দেয়ালে টাঙানো ফটোখানার নিচে গিয়ে দাঁড়াল সুকৃতি। এ ফটো সুকৃতির নিজের হাতে তোলা। একবার ফটো তোলার ভারি খেয়াল চেপেছিল বিমলের। ক্যামেরা কিনে যখন তখন যার তার ফটো তুলত। আচমকা অপ্রস্তুত অবস্থার অনেক ফটো তার তুলেছিল বিমল। অদ্ভুত সব ছবি। কোনটিতে সুকৃতি কুল খাচ্ছে, কোনটিতে বা কাপড়ের হিসাব নিয়ে ধোপার সঙ্গে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তর্ক করছে। অলক্ষ্যে লুকিয়ে থেকে বিমল সেই সব ছবি তুলত তার। সুকৃতি বলত, 'তুমি কি আমার একটাও ভালো অবস্থার ছবি তুলতে পার না?'

বিমল হেসে জবাব দিত, 'কেন, এ অবস্থাগুলি খারাপ কিসের? একেই তো রূপের দেমাকের অন্ত নেই, তারপর যদি অমন সাজানো গোছানো ছবি তুলি তুমি একেবারে পটের পটীয়সী হয়ে থাকবে। মাটিতে পা নামাবে না। কিন্তু ভালো হোক মন্দ হোক আমি তবু অনেক ছবি তোমার তুললাম। তুমি আমার একটি তুলে দাও না। চেহারা খারাপ বলে আমার একখানা ফটোও বুঝি আর ঘরে থাকতে নেই?'

সুকৃতি বলেছিল, 'নেই-ই তো। আমাকে ফটো তোলা শিখিয়ে না দিলে তুলব কি করে?'

বিমল বলেছিল, 'এসো শিখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ভাইস-প্রিন্সিপাল হৃষীকেশ মৈত্রের শিষ্যার কি আর কোন শিক্ষককে পছন্দ হবে?

আমার মত ছোটখাট প্রাইভেট টিউটরকে কি আর মনে ধরবে তোমার ?'

সুকৃতি বলল, 'বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে তোমার লজ্জা করে না ?'

বিমল বলেছিল, 'কই, করে বলে তো টের পাইনে। এসো তাহলে তোমাকে ক্যামেরার কাজে দীক্ষা দেই। দেখবে ওসব দর্শন-বিজ্ঞান কাব্য-সাহিত্যের চেয়ে আমার এই ক্যামেরাটি অনেক বেশি ইণ্টারেষ্টিং। পৃথিবীতে বই ছাড়া আরো অনেক জিনিস আছে—যেমন ক্যামেরা, পৃথিবীতে ভাইস প্রিন্সিপাল ছাড়া অন্ততঃ আরো একজন ব্যক্তি আছে—যেমন তাঁর এই পুত্ররত্ন।'

বিমলের ফটোর কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে এল সুকৃতি। শিয়রের কাছে র‍্যাকটা এদেশী ওদেশী দর্শন-সাহিত্যের বইয়ে ভর্তি। কিন্তু আজ একখানা বইও তার তুলে নিতে ইচ্ছা করল না। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল সুকৃতি। পৃথিবীতে বই ছাড়া আরো অনেক বস্তু আছে তা এমন নতুন করে আবিষ্কৃত হ'ল কেন। জীবনে স্মৃতি ছাড়া আরো কিছুর আকর্ষণ আছে তা কেন তাকে জানতে হল।

এম, এস, সি, পাশ করে এক কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীতে চাকরি নিয়েছিল বিমলেন্দু। তার পর থেকে বইপত্রের সঙ্গে তার আর বিশেষ যোগাযোগ ছিল না।

এসব প্রসঙ্গ উঠলে বিমল বলত, 'দেখ, আমি আর যাই হই না কেন বাবার প্রোটোটাইপ হতে রাজী নই। সারাজীবন কেবল ছাত্র পড়াব আর ছাত্র সেজে থাকব তা আমার দ্বারা হবে না। বাবা তো আমার সঙ্গে পেরে উঠলেন না তাই তোমাকে এনেছেন, দিন রাত্রির জন্য এক ছাত্রীকে দিয়েছেন গছিয়ে।'

কি আকৃতি কি প্রকৃতি কোন দিক থেকেই হৃষীকেশের সঙ্গে যেন মিল ছিল না বিমলের। অবসর সময়টা হৈ চৈ খেলা-ধূলা সিনেমা-থিয়েটার নিয়ে কাটাতেই সে বেশি ভালবাসত। ফলে পাড়ার অল্পবয়সী ছেলে-ছোকরার দলে তার ভক্তের সংখ্যা ছিল প্রচুর। তা দেখে বিমলের বাল্যকালের সহপাঠী আর হৃষীকেশের ছাত্র শেখর হেসে বলত, 'ওর আর বয়স বাড়ল না!'

বিমল জবাব দিত, 'না বাড়ুক সেই ভালো। তোমার মত আমি আমার বাবার বয়সী হতে রাজী নই।'

ছেলে যে তাঁর মত শান্ত গম্ভীর চিন্তাশীল হয়নি, কাব্যে-সাহিত্যে ওর যে তেমন অনুরাগ নেই তার জন্য মাঝে মাঝে হৃষীকেশ দুঃখ প্রকাশ করতেন, বলতেন, 'নিজের গোঁয়াতুমির জন্য অনেক ভালো জিনিসের স্বাদ ও পেল না।'

আবার কখনো বা হেসে বলতেন, 'এই ভালো, আনন্দ নিয়েই কথা। ও যদি ওসব জিনিসে সত্যিই আনন্দ পায় তাহ'লে আমাদের আপত্তির কি আছে, কি বল?'

সুকৃতি হাসত, 'গোড়া থেকে এক আধটু আপত্তি জানালে ভালো করতেন। আমার তো মনে হয় আপনার ছেলে আপনার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই এমন হয়েছে।'

হৃষীকেশও হেসেছিলেন, 'তাই নাকি? আচ্ছা বেশ, এবার তো তুমি এসেছ। কড়া শাসন ক'রে তুমি ওকে শুধরে তোল দেখি, বুঝব কি রকম বাপের বেটি!'

সুকৃতি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা আমি যদি ওঁর পরিবর্তন ঘটিয়ে ওঁকে একেবারে আপনার মত করে তুলতে পারি আপনি কি সত্যিই খুশি হবেন?'

হৃষীকেশ একটু চিন্তা করে বলেছিলেন, 'তোমার প্রশ্নটা আমি বুঝতে পেরেছি সুকৃতি। ছেলে অবিকল তার বাপের মত হোক এই কি বাপ চায়, না ছেলের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একজন হয়ে নিজেকে নতুন রূপে দেখতে তার সাধ জাগে, এই তো জিজ্ঞাসা?'

সুকৃতি মৃদু হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ, এবার জবাবটা দিন।'

হৃষীকেশ বলেছিলেন, 'তার আগে জবাবটা তোমার মুখ থেকেই শুনি।'

সুকৃতি এবারও একটু হেসেছিল. 'তার মানে আমার মুখে আপনি নিজের মুখের কথাই শুনতে পাবেন বলে আশা করছেন। কিন্তু আমি যদি তা না বলি?'

হৃষীকেশ বলেছিলেন, 'প্রফেসরের নোট মুখস্থ করা জবাব না লিখলে নম্বর কাটিব, আমাকে কি তেমন পরীক্ষক বলে তোমার মনে হয়?'

সুকৃতি বলেছিল, 'না, আপনি তেমন examiner নন। সেই ভরসায় আমি যা বুঝেছি তাই বলি। প্রথমে বাপ ছেলের মধ্যে নিজেকেই অবিকল দেখতে চান, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় না। বিশেষ ক'রে যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, সাহিত্যিক নিজেদের মনোযোগ আর চেষ্টা যত্নের অভাবে তাঁদের ছেলেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের হয়ে ওঠে। কিন্তু ততদিন বাপের মনে মমত্ব জন্মে যায়। 'কুর্বন্নপি ব্যলিকানি যঃ প্রিয়, প্রিয় এব সঃ,' তখন ঠিক যা চেয়েছিলেন তা না পেলেও স্নেহবশে, অভ্যাসবশে ছেলের মধ্যে বাপ নিজেকেই দেখতে পান। পাওয়া আর পেতে চাওয়ার মধ্যে একটা আপোষ নিষ্পত্তি ক'রে নিতে হয়।'

শুনতে শুনতে হৃষীকেশ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মনের ভাবটা আন্দাজ করতে পেরেছিল সুকৃতি। তাঁর ছেলের সঙ্গে সত্যিই

সুকৃতির মনের মিল হয়েছে কি না, সেই আশঙ্কা হয়ত হয়েছে হৃষীকেশের।

বিমলের সঙ্গে রুচিগত প্রকৃতগত অমিল খুবই ছিল সুকৃতির। কিন্তু এখন মনে হয় তা নিয়ে দু-জনের কারোর মনেই দুঃখ ছিল না, দুঃখবোধের আবশ্যক ছিল না। দিনের বেশির ভাগ সময় তার হৃষীকেশের সাহচর্যে কাটত।

বিমলকে রাত্রে যেটুকু সময়ের জন্য পেত স্বাদ-বৈচিত্র্যে তা যেন আরও উপভোগ্য হোত। বিমলেরও তাই। সারাদিনের হৈ চৈ হুল্লোড় করে, লঘু প্রকৃতির ছেলের দলের সঙ্গে মিশে রাত্রে সুকৃতিকে একটু স্বতন্ত্র রকমের লাগলেও সে স্বাতন্ত্র্যকে বিমল বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'তে দিত না। আদরের উত্তাপে সুকৃতির ভারিক্কিপনাকে সে অল্পক্ষণের মধ্যেই গলিয়ে তরল করে দিত।

এমনি ক'রেই পুরো দুটি বছর কেটেছিল, সারাজীবনই কাটাতে পারত, কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু ছিনিয়ে নিল বিমলকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিবৃত্তির জন্য দুই দলের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় সঙ্গীদের নিয়ে সে বেরিয়েছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে সে ফিরে এল না। সুকৃতি ফের যখন স্বামীকে দেখতে পেল, তখন ফুলে চন্দনে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা, জয়ধ্বনিতে আকাশ মথিত। শেষযাত্রার জন্য সে প্রস্তুত হয়েছে। শাশুড়ী চিৎকার ক'রে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদলেন, কিন্তু সুকৃতি কাঁদতে পেল না, কাঁদতে পারল না, শুধু ভিতরটা জ্বলে গেল।

সপ্তাহ খানেক বাদে হৃষীকেশ একদিন বললেন, 'ওর যে রকম স্বভাব ছিল তাতে হানাহানি ক'রে মরাই ছিল ওর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু একজনকেও ও মারেনি, মৃত্যুকে রোধ করতে গিয়েই ও মরল। এমন ক'রে বাঁচবার সাহস, এমন ক'রে মরবার সাহস আমার কিছুতেই

আসত না মা। ওদের জাত আলাদা। ওরা কেবল পড়ুয়া পণ্ডিত নয়, ওরা কর্মী। ম'রে ও আমাকে হারিয়ে দিয়ে গেল।'

সুকৃতি এ কথার কোন জবাব দিল না। সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতার সম্পর্কে পিতা পুত্রের মধ্যে থাকতে পারে, ছেলের মহৎ মৃত্যুর কাছে হার মেনে হৃষীকেশ আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারেন, কিন্তু সুকৃতির যা গেল তা তো গেলই। তার সারাজীবন কাটবে কি নিয়ে। সেই শূন্যতা সুকৃতি কি দিয়ে ভরবে। অন্ততঃ হৃষীকেশের সাহচর্যে নয়। বরং কিছুদিন শ্বশুরের সান্নিধ্য সুকৃতির কাছে দুঃসহ হয়ে উঠল। বিমল ছিল বলেই হৃষীকেশের অস্তিত্বের পটভূমির প্রয়োজন ছিল, এখন বিমল যখন নেই হৃষীকেশের থাকাও সুকৃতির কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে গেছে।'

হৃষীকেশ সুকৃতির মনের ভাব বুঝতে পারলেন। বুঝতে পেরে একটু যেন আহতই হলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ঠিক আগের মতই সুকৃতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বিমলের শোক ভুলে থাকবেন। পুত্রবধূর মধ্যে পুত্রের স্মৃতিকে প্রত্যক্ষ করবেন, কিন্তু তা হ'ল না। সুকৃতি পিছিয়ে গেল, সরে গেল। দুজনের একই অভাব, একই শোক, তবু যেন ঠিক এক নয়। সম্পদের দিনে দুজনের যে শ্রদ্ধা আর প্রীতির সম্পর্ক, যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, দুর্দিনের আঘাত তা সইতে পারল না।

এই সময় এসে হাজির হোল শেখর। ঠিক একা নয়, পাড়ার আরও কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে, পাড়ার আরো অনেক ছেলে বুড়োর প্রতিনিধি হয়ে।

শেখর এসে বলল, 'সবাই আমাকে ধরেছেন বিমলের নামে আমরা কিছু কাজ করি। পাড়ায় ছেলেদের যে ক্লাব আছে তার নাম পাল্টে ওরা বিমলের নামে রেখেছে। কিন্তু ছেলেদের আরো কিছু করবার ইচ্ছা। এ পাড়ায় তো ভালো লাইব্রেরী নেই, আমরা যদি

একটা লাইব্রেরী গড়ে তুলি কেমন হয়? মাষ্টার মশাই আর সুকৃতির কাছ থেকে যদি উৎসাহ পাই—'

হৃষীকেশ ম্লান হেসে বললেন, 'উৎসাহটা আমরাই বরং তোমাদের কাছে থেকে পেতে চাই শেখর। বেশ তো তোমরা যদি এ সব করতে চাও আমার যতটুকু সাধ্য করব।'

শেখর বলল, 'আপনার সাধ্য অনেকখানি। প্রথমতঃ সম্পূর্ণ একতলাটা আপনি ছেড়ে দিতে পারেন। আর আপনার যা বই আছে তা যদি আমরা পাই, তাহ'লে অন্ততঃ দুচার বছরের মধ্যে কলকাতার বইয়ের দোকানগুলিতে আমাদের না গেলেও চলে। চাঁদার টাকা আমরা অন্য কাজে ব্যয় করতে পারি; আপনি যদি বই যোগান পাঠক যোগাবার ভার আমরা নিই।'

হৃষীকেশ একটু চুপ ক'রে রইলেন। ছাত্র বয়েস থেকে একখানা একখানা ক'রে তিনি বইয়ের সংগ্রহ বাড়িয়েছেন। জলখাবারের টাকা বাঁচিয়ে, জামা কাপড়ের ব্যয় সংক্ষেপ ক'রে তিনি বই কিনেছেন। তারপর চাকুরী জীবনেও অন্য আমোদ-প্রমোদ, আসবাবপত্রের দিকে না তাকিয়ে তিনি গ্রন্থ সঞ্চয়ে মন দিয়েছেন। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম বয়সে তাঁর অনেক কলহ, কথান্তর হয়ে গেছে। হেমলতা রাগ করে বলেছেন, 'দুনিয়ায় বই ছাড়া কি তুমি আর কিছু চোখে দেখনি?'

হৃষীকেশ হেসে জবাব দিয়েছেন, 'না, আরো একজনকে দেখেছি।'

হেমলতা বলেছেন, 'ছাই দেখেছ। দিন রাত তো বইয়ের পাতার আড়ালেই চোখ ঢেকে রাখ। আর কোন দিকে লক্ষ্য থাকে না কি তোমার?'

হৃষীকেশ বই সরিয়ে রেখে হেসে স্ত্রীর হাত নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে বলেছেন, 'থাকে হেম, থাকে। বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে যখন আর

একজনের মুখ চোখে পড়ে, সে মুখ যে আরো কত সুন্দর দেখায় তা তুমি জানো না।'

হেমলতা নরম হয়েছেন, কিন্তু মুখে বলেছেন, 'থাক, আর বাক্যে কাজ নেই আমার, ঘরের অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীর হয়ে হৃষীকেশ মনে মনে আবৃত্তি করেছেন, 'থাকি যবে গৃহ কাজে, তোমারই সে গৃহ নাথ, তোমারই সে কাজ, বইও তো তাই। বইও তো তোমার। বই যখন পড়ি, তোমাকে ভালোবাসবার জন্যই পড়ি, তোমাকে ভালবাসি বলেই পড়ি। সে বইয়ে তোমারই কথা, তোমারই কাহিনী।'

বড় হয়ে বিমলও বাপের বই কেনার বাতিককে প্রশ্রয় দিয়েছে। জন্মদিনে, কি অন্য কোন উৎসবের দিনে অনেক টাকার বই কিনে এনেছে। সেই সব বই, তার পাতায় পাতায় মমত্ব ছড়ানো।

তাঁকে নীরব থাকতে দেখে শেখর বলেছিল, 'অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে তবে আমরা অন্য ব্যবস্থা করি।'

হৃষীকেশ সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, 'না আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু শেখর বইয়ের যত্ন তো সবাই জানে না শেখর, অনধিকারীর হাতে পড়ে বইয়ের বড় অনাদর হয়।'

শেখর বলেছিল, 'সুযোগ না পেলে অনধিকারীরা অধিকারী হবে কি করে মাষ্টার মশাই?'

হৃষীকেশ সম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন, 'আচ্ছা।'

মূল্যবান, অতি প্রয়োজনীয় সামান্য কিছু বই রেখে একে একে সমস্ত বইয়ের আলমারী একতলায় বিমল সংস্কৃতি-কেন্দ্রকে দান করলেন হৃষীকেশ।

শেখর বলল, 'ভাববেন না, মাষ্টার মশাই। এ লাইব্রেরী রক্ষণা-বেক্ষণের ভার সুকৃতির ওপরই থাকবে, চাবি থাকবে ওঁরই হাতে। আলমারীগুলি শুধু দোতলা থেকে একতলায় নামল, বইগুলি শুধু একজনের হাত থেকে দশজনের হাতে গিয়ে পৌঁছবে।'

হৃষীকেশ একটু হাসলেন, 'পৌঁছুক তাতে ক্ষতি নেই, অক্ষতভাবে ফিরে এলে হয়।'

শেখর বলল, 'সে ভার আমার ওপর রইল। এখান থেকে কিচ্ছু হারাবে না। সুকৃতি বউদি, আপনি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিন। লাইব্রেরীয়ান হতে হবে আপনাকে।'

সুকৃতি বলল, 'ব্যাপার মন্দ নয়। আমরা বাড়ী দিলাম, বই দিলাম, আবার লাইব্রেরীয়ানও হব! অথচ কাজটা হ'ল আপনাদের দশজনের।'

শেখর বলল, 'দশজনেরই তো। কিন্তু আপনিও সেই দশজনের একজন। আপনার সরে গেলে চলবে না।'

সুকৃতি সরে গেল না বরং এগিয়ে এল। দোতলা থেকে একতলায়। মাত্র গোটা কয়েক সিঁড়ির ব্যবধান। কিন্তু এ ব্যবধান যেন অনেক-খানি। এ ব্যবধান চিন্তা আর চেষ্টায়, এ অবতরণ কথা থেকে কর্মে। অথচ এমন কিছু কাজ নয়। শেখরের সাহায্যে বইগুলির শ্রেণী-বিভাগ করে একটা তালিকা তৈরী করল সুকৃতি। লিখতে হ'ল নিজের হাতে। প্রথমে শেখরকেই লিখতে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু শেখর রাজী হ'ল না, বলল, 'না তার চেয়ে আপনিই লিখুন। অফিসে কলম পিষে পিষে আমার হাতের অক্ষর একেবারে দেবাক্ষর হয়ে গেছে। আর কেউ তো দূরের কথা, অনেক সময় আমি নিজেও পাঠোদ্ধার করতে পারিনে।

সুকৃতি মৃদু হেসে বলেছিল, 'আচ্ছা আমিই লিখছি। আমার হাতের লেখাও কিন্তু ভালো নয়।'

শেখর বলল, 'আমার চেয়ে অনেক ভালো।'

নির্দিষ্ট দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন হ'ল বিমল সংস্কৃতি-কেন্দ্রের। দেশের সর্বাধিক লোকপ্রিয় প্রবীণ সাহিত্যিক এসে পাঠভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। বিমলেব সারল্য, সাহস, সততার অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তার বন্ধবান্ধব, পবিচিত, অপরিচিতের দল বক্তৃতা দিলেন। পরদিন থেকে কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়ে গেল। পাড়ার ছেলেমেযেরা চাঁদা দিয়ে কেন্দ্রের সদস্য হ'ল, বই পড়বার উৎসাহ আর আগ্রহ বাড়তে লাগল তাদের। সহরের যাঁরা গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত, শিল্পী—তাঁদের একে একে, কোন কোন দিন বা একসঙ্গে অনেককে কেন্দ্রে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতে লাগল শেখর। সাপ্তাহিক অধিবেশন-গুলি তাঁদের সুচিন্তিত ভাষণ আর রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

হৃষীকেশ কোনদিনই তেমন মিশুক ছিলেন না, এখনও হতে পারেননি। কলেজের দু' একটি ক্লাস সেরে ঘরের কোনে নিজের মনে পড়াশুনো করেন। শুধু বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের দিনে শেখর তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে আসে, কোনদিন বা বসিয়ে দেয় সভাপতির আসনে। কাজ সেরে অল্পক্ষণের মধ্যেই হৃষীকেশ বিদায় নেন।

কিন্তু সুকৃতি যায় না, তার গেলে চলে না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে থাকে। আর তার ফলে কারো উঠবার কথা মনে থাকে না। যেদিন লোকজন কম হয়, ছোট বৈঠক বসে সুকৃতি নিজের হাতে চা পরিবেশন করে, নিজের হাতের তৈরী করা সিঙ্গাড়া সন্দেশ অভ্যাগতদের সামনে এনে ধরে। আলাপ আলোচনার সময় বেশি

কথা বলে না সুকৃতি। বরং স্বল্পভাষিণী মুখচোরা মেয়ে বলেই তাকে মনে হয়। কিন্তু তার উপস্থিতিতে সকলের বলবার আগ্রহ বাড়ে। কারণ সকলেই জানেন সুকৃতির মত এমন বুদ্ধিমতী শ্রোত্রী সহজে মেলে না। আলোচনার মাঝে মাঝে যখন যোগ দেয় সুকৃতি, তখন বোঝা যায়, বুঝবার আর বোঝাবার ক্ষমতাও তার নেহাৎ কম নেই। সাহিত্য আর দর্শনে পড়াশুনো অনেকের চেয়েই তার বেশি।

হৃষীকেশের অধ্যাপক-বন্ধুর দল খুশি হয়ে বলেন, 'এম এ পরীক্ষাটি তুমি দিয়ে দাওনা কেন সুকৃতি। তোমার তো কোন অসুবিধে নেই, ইউনিভার্সিটিতে যদি না যেতে চাও, নাইবা গেলে। তোমার শ্বশুর তো একাই একটি ইউনিভার্সিটি।'

সুকৃতি স্মিতমুখে চুপ করে থাকে।

কিন্তু যেদিন আর কেউ আসে না, সেদিনও শেখর আসে। বৃষ্টির দিন, ঝড়ের দিন, ছুটির দিন, কোনদিনই প্রায় বাদ যায় না। কোনদিন বা বইয়ের স্টক মিলায়, কোনদিন বা কেন্দ্রের অন্য কাজে মন দেয়। লাইব্রেরী ঘরে সুকৃতিকেও কাজে ব্যস্ত দেখা যায়। কোনদিন বা কেন্দ্রের মুখপত্র 'সংস্কৃতির' প্রুফ দেখে।

শেখর একদিন বলল, 'কেমন লাগছে এসব কাজ?'

সুকৃতি প্রুফ থেকে মুখ তুলে বলল, 'ভালো। কাজের সবচেয়ে বড় গুণ তা বেশ ভুলিয়ে রাখে। পড়াশুনোয় এমন করে ভুলে থাকা যায় না।'

শেখর একটু চুপ করে থেকে বলে, 'কিন্তু আমরা তো ভুলে থাকতে চাইনে, কাজের ভিতর দিয়ে আমরা তাকে মনে রাখতে চাই। জানেন, পড়াশুনোয় বিমলের তেমন ঝোঁক ছিল না, কিন্তু লাইব্রেরী করার দিকে ওর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি।'

সুকৃতি বিস্মিত হয়ে বলল, 'তাই নাকি! কই আমাকে তো এসব কথা কোনদিন বলেন নি?'

শেখর একটু হাসল, 'ও যে ওর বাবার মত নয়, আমাদের মত নয়, তাই দেখাবার জন্য এসব কথা, এসব ইচ্ছা ও আপনার কাছে জোর করে চেপে গেছে। অনেকের অনেক রকম বাতিক থাকে। ওর বাতিক ছিল ওর বাবার প্রোটোটাইপ না হওয়া। আমরা যদি ওর কাছ থেকে কোন কাজ কোন জিনিস আদায় করতে চাইতাম, বলতাম মাষ্টার মশাই কিছুতেই একাজ করতে পারতেন না, এ জিনিস দিতে পারতেন না। আর সঙ্গে সঙ্গে বিমল রাজী হয়ে যেত।'

সুকৃতি এবার হাসল, 'আপনিও তো তাহলে ফন্দিবাজ বড় কম ছিলেন না।'

শেখর বলল, 'কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে ওর ফন্দির ওপরই আমরা সব চেয়ে বেশি নির্ভর করতাম।'

বলে' বাল্যের, কৈশোরের গল্প শুরু করল শেখর। চিরকালই এ্যাডভেঞ্চারের দিকে ঝোঁক ছিল বিমলের। ক্লাস পালানো মাষ্টার-মশাইদের জব্দ করা, চুরি করে অন্যের বাগান থেকে পেয়ারা পেড়ে আনা, পিকনিক করতে যাওয়া, অন্যের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটানো, এমনি টুকরো টুকরো অনেক কাহিনী—যা প্রায় সব ছেলের জীবনেই ঘটে। অথচ শুনতে শুনতে সুকৃতির মনে হোত এমন সব অনন্যসাধারণ ঘটনা শুধু শেখর আর বিমলের জীবনেই ঘটেছে। অতীতের স্মৃতি থেকে দুটি দুরন্ত কিশোর যেন জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। হৃষীকেশ আর হেমলতাও কোনদিন তাঁদের, ছেলের ছেলেবেলাকে এমন করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি।

শেখর আর সুকৃতির মধ্যে যখন এই স্মৃতি মন্থন চলত, হেমলতা মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াতেন। কোন কোন দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতেন, কোনদিন বা আর দাঁড়াতে পারতেন না। চোখে আঁচল চেপে সরে যেতে যেতে বলতেন, 'তুমি চুপ করো শেখর আমার পরম শত্তুরের নাম আর মুখে এনো না।'

কিন্তু হেমলতা চলে গেলে কৈশোরের পালা থেকে হঠাৎ এক সময় কলেজ জীবনের কাহিনীতে চলে যেত শেখর। কলেজের কমন-রুম, বিতর্ক সভা, ইলেকশন নিয়ে রেষারেষি, একজন প্রভাবশালিনী স্থূলকায় সহপাঠিনীকে দলে টানবার জন্য তার সঙ্গে বিমলের অনুরাগের অভিনয়, শেষরক্ষা করবার জন্য শেখরের এগিয়ে আসা, এমনি সব গল্প শুনতে শুনতে সুকৃতির মত গম্ভীর স্বভাবের মেয়েকেও মুখে আঁচল চাপতে হোত।

শেখর কিন্তু থামত না, গম্ভীরভাবে বলত, 'আপনি হাসছেন, কিন্তু বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে আমার তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি।'

'কেন?'

শেখর বলল, 'কেন আবার। সহাধ্যায়িনীটি তখন আমার কাঁধে পড়ো পড়ো হবার জো হয়েছেন।'

'কাঁধে নিলেই পারতেন।'

শেখর শিউরে ওঠার ভঙ্গিতে বলত, 'ওরে বাপরে, কাঁধ ভেঙ্গে যেত।'

শুনতে শুনতে সুকৃতি একদিন না বলে পারল না, 'কি অন্যায় ধারণা! মেয়েরা বুঝি কেবল পুরুষের কাঁধ ভাঙবার জন্যই জন্মেছে।'

শেখর জবাব দিল, 'এতদিন সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু এখন আর তা নেই।'

সুকৃতি বলল, 'তবু ভালো, কিন্তু ভুলটা ভাঙল কি করে?'

শেখর সুক্বতির দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সে কথা আর একদিন বলব।'

ওর এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ভঙ্গিতে সুক্বতির ভিতরটা যেন শিউরে উঠল, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না।

কিন্তু জিজ্ঞাসা না করেও জানতে হ'ল, শুনতে হ'ল। সুক্বতি যতটা অবাক হবে, যতটা আঘাত পাবে ভেবেছিল, তাতো কই পেল না! বলতে পারল না, 'ও কথা তুমি বলোনা, ও কথা বলা পাপ।'

বলতে পারল না, 'তুমি চলে যাও, তুমি আর এস না।'

কারণ ততদিনে এমন হয়েছে যে, শেখর না এলে বিমল সংস্কৃতি কেন্দ্রের কাজে মন বসে না সুক্বতির, এমন অভ্যাস জন্মে গেছে যে, বিমলের স্মৃতিকথা শেখরের মুখ থেকে না শুনলে ভালো লাগে না। আজ দেখল কখন অলক্ষিতে কথার চেয়ে .কথকই একটু একটু করে তার মনের সবখানি জায়গা জুড়ে বসেছে।

তবু প্রথমটা এড়াতে চেষ্টা করেছিল। সরে থাকতে, লুকিয়ে থাকতে চেষ্টা করেছিল সুক্বতি। শরীর খারাপ হওয়ার অজুহাতে কদিন আর নিচে নামেনি। কিন্তু শেখরের সাহসের অন্ত নেই। সে ওকে ঘরের কোণ থেকে খুঁজে বের করল, কপালে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করল, তারপর সেই হাতেই শক্ত করে চেপে ধরল ওর মুঠি।

কেবল কব্জির জোরই তো নয়, যুক্তির জোরও ওর আছে।

'কেন অত সঙ্কোচ করছ তুমি। আমরা তো কোন অন্যায় করছি না, কারো অধিকার কেড়ে নিচ্ছি না, আর কারো দাবীকে অগ্রাহ্য করছি না, কাউকে বঞ্চিত করছি এমনও তো নয়। নিরর্থক

লজ্জায়, কর্মপরিষদের গুটিকয়েক প্রৌঢ়ের সমালোচনার ভয়ে সারাজীবন ধরে নিজেদের বঞ্চনা করলেই কি আমরা খুব লাভবান হব ?'

সুকৃতি বলেছিল, 'কিন্তু বাবা, মা ?'

'মানে তোমার শ্বশুর শাশুড়ী ? বিচ্ছেদের দুঃখ তো তাঁদের সইতেই হবে। এমন দুঃখ তোমার নিজের বাবা মাও তো একদিন পেয়েছিলেন, গায়ত্রীর কাছ থেকেও তার বাবা মা পেয়েছেন। এ দুঃখ তাঁদের সইবে। কিন্তু তোমার সারাজীবন লজ্জা আর সংস্কারের ভয়ে নিষ্ফলা মরুভূমি হয়ে থাকবে তা আমার সইবে না।'

শুধু শেখর নয়, মন স্থির করতে হৃষীকেশই সুকৃতিকে বেশি সাহায্য করলেন, নিজেই উদ্যোগী হয়ে ডাকিয়ে আনলেন শেখরকে। বললেন, 'আমার সেদিনের অধীরতার জন্য কিছু মনে করো না।'

শেখর মাথা নিচু করে বলল, 'মনে করেছিলাম বলে আজ লজ্জিত হচ্ছি।'

হেমলতাকে বুঝানো গেল না। তিনি রাগ করে ভবানীপুরে তাঁর দাদার কাছে চলে গেলেন। সুকৃতির বাবাকেও খবর দিয়ে আনিয়ে সব কথা বললেন হৃষীকেশ।

জিতেনবাবু বললেন, 'আপনার আচরণ আমার ভালো লাগছে না বেয়াই, ওর কপালে যা ছিল হয়েছে। দুদিনের জন্য হলেও সুখ-শান্তির স্বাদ ও পেয়েছে। আমার বিধবা মেয়ের ফের বিয়ে না দিয়ে যদি ওর আইবুড়ো বোনগুলির একটা ব্যবস্থা করতেন আমার অনেক উপকার হোত। তা ছাড়া আপনার ঘরে মেয়ে দিয়েছিলাম কি এই জন্যই ? আপনি শেষ পর্যন্ত ভিন্ন জাতের ঘরে ওকে ঠেলে দিলেন ? এমন করে জাত মারলেন আমার ? আমাকে তখনই অনেকে নিষেধ করেছিল। বারেন্দ্র শ্রেণীর বামুনকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। তারা সব পারে।'

জিতেনবাবুর কথার ধরণে হৃষীকেশ রাগ করলেন না, হেসে বললেন, 'তা অনেকটা ঠিকই বলেছেন। এতখানি যে পারব ভাবিনি। কিন্তু জিতেনবাবু, এখন জাত যা যাবার আমারই যাবে। আপনি তো ওকে গোত্রান্তর করেই দিয়েছিলেন, আপনার আর ভয় কি।'

কিন্তু গোত্রান্তর করলেই বুঝি অন্তরের ব্যাথা মরে, মনের সব দুঃখ, সব জ্বালা দূর হয়, সন্তানের হিতাহিতের ভাবনা আসে না?

রাগ করে রূঢ় ভাষায় আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন জিতেনবাবু, সুকৃতি এসে সামনে দাঁড়াল, তুমি ও ঘরে চল বাবা। ওকে মিছামিছি দোষারোপ কোরো না। যা বলবার আমাকে বল।'

জিতেনবাবু বললেন, আমি কাউকে আর কিছু বলতে চাইনে সুকু। আমার সব বলা-শোনা শেষ হয়ে গেছে। আমি এখান থেকে এখন উঠতে পারলেই বাঁচি।'

বলে সত্যি সত্যিই উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিলেন জিতেনবাবু। মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে এককাপ চা পর্যন্ত গ্রহণ করলেন না।

সপ্তাহ দুই বাদে সুকৃতিকেও একদিন বিদায় নিতে হ'ল। মনে পড়ল চার বছর আগে আর একটি আনন্দের দিনে স্নেহপ্রবণ প্রৌঢ়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে নিতে চোখের জল ফেলেছিল সুকৃতি। সেদিন তাঁরও চোখ শুকনো ছিল না। আজ তিনি বিমুখ হয়ে চলে গেছেন। কিন্তু হৃষীকেশর মুখে অবিকল তাঁরই মুখ ফুটে উঠেছে।

সুকৃতি ডাকল, 'বাবা'।

হৃষীকেশ সস্নেহে তাঁর পিঠে হাত রাখলেন।

বাড়ীর দুটি চাকর টানাটানি করে' ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, বিছানা আসবাবপত্র, রাশীকৃত করল দোরের সামনে। শুধু ট্যাক্সি নয়,

জিনিসপত্র বয়ে নেওয়ার জন্য একখানা লরী পর্যন্ত এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে।

শেখর দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, 'এসব কি মাষ্টার মশাই এত জিনিসপত্র কোথায় যাবে।'

হৃষীকেশ বললেন, 'এ সব জিনিসই সুকৃতির। ওর সঙ্গে এগুলি তাই দিয়ে দিচ্ছি।'

শেখর স্থিরদৃষ্টিতে জিনিসগুলির দিকে তাকাল। বিমল আর সুকৃতি যে বড় খাটখানা ব্যবহার করেছে, সেই খাট, যে আলনায় বিমলের স্যুট ঝুলানো থাকত, সেই আলনা। যে আলমারি দরকারী অদরকারী নানা জিনিসে বিমল বোঝাই করে রাখত সেই আলমারী।

কিসের একটা অস্বস্তিতে যেন সর্বাঙ্গ শির শির করে উঠল শেখরের। যেন অদৃশ্য কোন প্রেতের অশুচি দুঃসহ শীতল স্পর্শ তার গায়ে এসে লেগেছে।

শেখর মাথা নেড়ে বলল, 'না মাষ্টার মশাই, এগুলি তো সুকৃতির সঙ্গে যাবে না, এসব আপনি তুলে রাখুন।'

হৃষীকেশ শেখরের দিকে তাকালেন, 'তুলে রাখব? কিন্তু এগুলি তো আমার আর কোন কাজে আসবে না শেখর। এসব ব্যবহার করবার আর তো কেউ নেই।'

শেখর বলল, 'তাহলে এসব বরং আপনি গায়ত্রীকে দেবেন।'

হৃষীকেশ বললেন, 'গায়ত্রী আর সুকৃতিকে আমি তো আলাদা করে দিখিনি শেখর। গায়ত্রীকে আমি বিয়ের সময় সব দিয়েছি। ওর এসব জিনিসের অভাব নেই।'

শেখর বলল, 'আমার অবশ্য অভাব আছে। কিন্তু এসব জিনিস-ব্যবহারে আমার প্রবৃত্তি নেই, প্রয়োজন নেই মাষ্টার মশাই।'

হৃষীকেশ স্থির দৃষ্টিতে শেখরের দিকে তাকালেন।

শেখর বলল, 'তা ছাড়া সুকৃতি এখন চলল গরীবের ঘরে। একতলা ভাড়াটে বাড়ি। ছোট দুখানা ঘর। একখানায় মা থাকেন। রাজ্যের হাঁড়িকুড়ি দিয়েই তিনি গরীবের গৃহস্থলী গড়ে তুলেছেন। এসব জিনিস রাখবার তো সেখানে জায়গা হবে না।'

হৃষীকেশ একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার ঘর যে অত ছোট তা আমার জানা ছিল না শেখর! আচ্ছা ওগুলি তাহলে এইখানেই থাক। ও দেবেন, ও গোপাল, ফার্নিচারগুলো সব নামিয়ে নে তো।'

চাকরেরা জিনিসগুলি ফের নামাতে শুরু করল।

সুকৃতি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। এবারকার অনুষ্ঠান শুধু রেজিস্ট্রি অফিসের শপথ বাক্যের মধ্যে শেষ হয়েছে। কেউ হুলুধ্বনি দেয়নি, শাখ বাজেনি, সানাই শোনা যায়নি। তবু দুপুরের পর বিকাল, বিকালের পর গোধূলি রঙ লেগেছিল আকাশে, সুর বেজেছিল মনের মধ্যে। এক আচমকা আঘাতে সে সুর থেমে গেল। সানাইদারের হাত থেকে কে যেন বাঁশীটা হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কি হ'ল, কেন এমন হ'ল!

ইশারায় শেখরকে কাছে ডেকে আনল সুকৃতি, একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, 'ও কি করছ! 'ওঁকে ওসব কথা কেন বলতে গেলে।'

শেখর বলল, 'কিন্তু ওসব জিনিস নিতে আমার লজ্জা করছিল সুকৃতি।'

'লজ্জা আমারও করছিল, কিন্তু উনি যখন দিতে পারলেন, নিতে না পারায় আমাদের লজ্জা যে আরো বেশি, ওঁর কাছ থেকে আমরা অনেক নিয়েছি।'

শেখর বলল, 'তা নিয়েছি। কিন্তু এসব নিতে পারব না।'

সুকৃতি আর কোন কথা বলল না।

বেরুবার আগে হৃষীকেশকে প্রণাম করে বলল, 'আপনি রাগ করে থাকবেন না, যাবেন কিন্তু, বেশি দূর তো নয়।'

হৃষীকেশ একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'না গড়পার আর এখান থেকে দূর কিসের, রাস্তার এপার আর ওপার। আচ্ছা যাব একদিন।'

মাণিকতলা থেকে গড়পাড় দূর নয়, কাছেই। তবু এইটুকু পথ যেতে যেতে সুকৃতির মনে হ'ল যেন লোক থেকে লোকান্তরে যাত্রা করেছে। পথের যেন শেষ নেই। শেখরের বাসায় অবশ্য এর আগে আরো দু' একবার এসেছে সুকৃতি। বিমল সংস্কৃতি-কেন্দ্রের কাজে আসতে হয়েছে। কিন্তু আজকের আসা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আজকের দিনের রং আলাদা, রূপ আলাদা, সুর আলাদা। কিন্তু তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সুর বাজছে না কেন!

শেখর স্ত্রীর পাশে এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, এবার বলল, 'তোমাকে আগেই বলেছি মা'র এ বিয়েতে মত ছিল না। তিনি সাদরে সাড়ম্বরে বধূবরণ করবেন তেমন আশা কোরো না। ভেবেছিলাম, প্রথমে একটি হোটেলে-টোটেলে গিয়ে উঠব, কিন্তু তাতেও মা রাজী হননি। তা ছাড়া ভাবলাম, ওভাবে পালিয়ে বেড়িয়েও তো লাভ নেই। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানোই ভালো, তোমার কি ভয় করছে?'

সুকৃতি মৃদুস্বরে বলল, 'না, ভয় কিসের, তুমি যখন পাশে আছ—'

শেখর একটু হাসল, 'হ্যাঁ, গাড়ীর মধ্যে আপাততঃ পাশেই আছি। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে তো আর সব সময় পাশে থাকতে পারব না। কাজকর্মে বেরুতেই হবে। তখন মার সঙ্গে একা তোমার মোকাবিলার পালা। ভয় করবে নাকি?'

সুকৃতি বলল, 'না মাকে আমার কোন ভয় নেই।'

শেখর চোখ তুলে তাকাল, 'তবে কাকে তোমার ভয়?'

সুকৃতি একথার কোন জবাব না দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল।

মান অভিমান ছেলের সঙ্গেই সরোজিনী যা করবার করেছেন। সুকৃতিব সঙ্গে কোনরকম বিসদৃশ আচরণই তিনি করলেন না। আত্মীয়-স্বজন বড কেউ নেই, দূরা সম্পর্কের যারা আছে তাদের শেখর ইচ্ছা করেই খবর দেয়নি। সরোজিনীও এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করেন নি। দোতলার ভাডাটে বিধুবাবুর দুই মেয়ে চন্দ্রা আর নন্দাই শাঁখ বাজিয়ে অনুষ্ঠানে একটু সুরের ছোঁয়াচ লাগালো। সুকৃতি সরোজিনীকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'আগে ও ঘবে চল।'

সরোজিনী নিজের শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন। স্বামীর সঙ্গে সুকৃতি এলো পিছনে পিছনে।

ঘরের এক কোণে একখানা জলচৌকির ওপর সাদা আর কালো পাথরের ছোট ছোট দুটি মূর্তি।

সরোজিনী বললেন, 'আমাদের ইষ্টদেবতা, রাধাশ্যাম বৃন্দাবন থেকে তোমার শ্বশুর নিয়ে এসেছিলেন।' পাশের আর একখানা চৌকির দিকে আঙুল বাডিয়ে বললেন, 'ওই যে তিনি।'

তাঁর দেখাবার আগেই সুকৃতি দেখেছে। দ্বিতীয় জলচৌকি-খানার ওপর তরুণবয়স্ক আর একটি পুরুষের সুবৃহৎ চিত্র-প্রকৃতি। বোধহয় অল্প দিন আগে নতুন করে প্রিণ্ট আর এন্‌লার্জ করা হয়েছে। শেখরের চেয়ে ওর বাবা দেখতে যে বেশ সুপুরুষ ছিলেন তা বোঝা যায়। তাঁর দীর্ঘ নাক আর প্রশস্ত কপাল আর আয়ত

চোখের কিছুই শেখর পায়নি। কিন্তু আশ্চর্য, ঠিক এমনি নাক, এমনি চোখ সুকৃতি আরো একজনের যেন দেখেছে। সে কথা মনে হতেই ওর সর্বাঙ্গ শির শির করে উঠল। বড়ো ফটোতে ভারি আপত্তি ছিল তার। 'সে বলত, 'তাতে আসল মানুষটি ছোট হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমি যখন মরব তখন না হয় একটা ফটো বড় করে বাঁধিয়ে রেখো ঘরে।'

সুকৃতি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, 'ফের যদি তুমি ওসব বাজে কথা বলো—'

সে জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, 'দেখ বাজে কথা হাত দিয়ে চেপে বন্ধ করা যায় না, আর কিছু দিয়ে চেপে রাখতে হয়।'

বলতে বলতে মৌখিক পরামর্শকে ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করেছিল সে।

সুকৃতিকে নিশ্চলভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সরোজিনী একটু তিক্তকণ্ঠে বললেন, 'হয়েছে মা, এবার এসো। ঠাকুর দেবতা তোমরা মান না জানি, কিন্তু শ্বশুরের ফটোর সামনে একটু মাথা নোয়ালেও পারতে।'

সুকৃতি এই অনুযোগের কোন জবাব না দিয়ে নীরসকণ্ঠে বলল, 'চলুন।'

সরোজিনী ছেলের দিকে একবার তাকালেন, তারপর আগে আগে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সন্ধ্যার পর নন্দা আর চন্দ্রা একরাশ রজনীগন্ধা আর দুটি গোড়ের মালা নিয়ে এসে শয্যাকে ফুলশয্যা বানাল।

নন্দা বলল, 'অমনিতে ছাড়ছিনে শেখরদা, খাওয়াতে হবে।'

চন্দ্রা বলল, 'অমন চুপ করে থাকলে চলবে না বৌদি। গান শোনান। দাঁড়ান, ওপর থেকে হারমনিয়মটা নিয়ে আসি।'

সুক্তি একটু হেসে বলল, 'গান তো আমি জানিনে ভাই, গান তোমরা গাও, আমি শুনি।'

নন্দা হেসে উঠল, 'তবেই হয়েছে। দিদির গলা কাটলেও সুর বেরুবে না।'

চন্দ্রা বলল, 'আচ্ছা তোর তো বেরুবে। তোর মধুকণ্ঠই না হয় একটু শুনিয়ে দে বউদিকে।'

কিন্তু সুক্তির শোনবারও যেন তেমন আগ্রহ নেই। উৎসাহ না পেয়ে দুই বোন হারমনিয়ম আনবার ছলে সেই যে ওপরে চলে গেল আর নামলো না।

রাত্রে শেখর ঘরে এসে দেখল সুক্তি ঘরের এককোণে জানালার ধারে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আলো নিবিয়ে দিয়ে শেখর ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল, স্ত্রীর কাঁধে একখানা হাত রেখে মৃদুস্বরে ডাকল, 'সুক্তি।'

ও যে শিউরে উঠেছে তা স্পষ্ট টের পেল শেখর। একটু চুপ করে থেকে বলল. 'তুমি আজও কিছু ভুলতে পারনি।'

সুক্তি কোন জবাব দিল না।

শেখর কোমল কণ্ঠে বলল, 'জানি ভোলা অত সহজ নয়! কিন্তু ভুলতে তো হবেই। প্রেতকে তো আমাদের জীবনের সঙ্গে চিরকাল জড়িয়ে রাখতে পারিনে সুক্তি।'

প্রেত। কথাটি সুক্তির বড় বিশ্রী লাগল কানে। বিমলের সম্বন্ধে এত বড় একটা রূঢ় শব্দ না উচ্চারণ করে কি পারত না শেখর? ভুলতে হয়, ভুলতে হবে, একথা সবাই জানে। তা কি এমন জোর গলায় বলবার দরকার ছিল!

শেখর বলল, 'রাত অনেক হয়ে গেছে। এবার শোবে এস।'

সুকৃতি মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তুমি যাও ঘুমোও গিয়ে। আমি বরং এখানে আর একটু দাঁড়াই। কেন যেন ঘুম পাচ্ছে না।'

শেখর অধীর স্বরে বলল, 'ঘুম আমারও পাচ্ছে না। শুনেছি আজ নাকি একসঙ্গেই জাগতে হয়। আজকার রীতিনীতি তোমারই তো বেশি জানবার কথা।'

বলেই হঠাৎ থেমে গেল শেখর। এ ধরনের কথা তো বলবার তার ইচ্ছা ছিল না। তার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, তার মুখ কিছুতেই সে চাপতে পারলো না।

শেখর লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমি কিছু ভেবে বলিনি সুকৃতি। কিছু মনে কোরো না।'

সুকৃতি বলল 'না, মনে করবার আর কি আছে, চল।'

বিছানায় শুয়ে শেখর বলল, 'এর চেয়ে যদি ওদের অনুরোধ রাখতে, একটু গানটান গাইতে মনটা হালকা হোত। চন্দ্রা নন্দাকে অমন মিথ্যা কথাটা বলতে গেলে কেন, তুমি তো গান জানো। সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেবারের ফাংশনে তুমি তো একখানা চমৎকার রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিলে।'

সুকৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু সেই গান কি এখানে জমত?'

শেখর বলল, 'না, তা জমত না, কিন্তু সেই শোক-সঙ্গীত ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তো অন্য রকমের গানও লিখেছেন, তার দুটি একটিও কি তোমার আজ মনে পড়ল না?'

সুকৃতি চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ফের কথা বলল শেখর, 'আর একটা কথা। মা যখন তোমাকে বাবার ফটোর কাছে নিয়ে গেলেন, একটা প্রণাম করলে ক্ষতি ছিল কি?'

সুকৃতি জবাব দিল, 'নিজে যখন কোন ফটো পুজো করলাম না, তখন অন্যের পুজোর ওপর কি করে ভক্তি আসে বল?'

শেখর বলল, 'ও। কিন্তু দু বছর ধরে আমরা কি কম পূজো করেছি? তাতেও যদি তোমার সাধ না মিটে থাকে তুমি তার ফটো এনে এ ঘরে টানিয়ে রাখতে পার, আমি তাতে কিছুমাত্র আপত্তি করব না।'

সুকৃতি একথার কোন জবাব না দিয়ে পাশ ফিরল।

একটু বাদে ফের যখন স্ত্রীকে কাছে টেনে নিল শেখর, তখন তার ঠোঁটে লোনা জলের দাগ লাগল।

অনুতপ্তস্বরে শেখর বলল, 'আমাকে ক্ষমা করো সুকৃতি, ক্ষমা করো। আমি এসব কথা বলতে চাইনি। দুঃখ দিতে চাইনি তোমাকে। আজকের রাত সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম কল্পনাই ছিল। কিন্তু কল্পনা আর বাস্তবে যে এত তফাৎ তা আমার জানা ছিল না।'

সুকৃতি নিজেই কি তা জানত? সুকৃতি নিজেই কি বুঝতে পেরেছিল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সেই কর্মী শেখরের পার্থক্য এক রাত্রেই এমন করে ধরা পড়বে?

পরদিন সরোজিনী বললেন, 'একটা কথা নিজের মুখেই তোমাকে বলছি বাছা, কিছু মনে করোনা।'

সুকৃতি বলল, 'বলুন।'

সরোজিনী বললেন, 'এখানে পাঁচ ঘর পাড়া প্রতিবেশী নিয়ে আমাদের বাস করতে হবে। তাদের নিন্দামন্দ আমাদের তো একেবারে অগ্রাহ্য করলে চলবে না মা। তা ছাড়া আগে তোমার কি হয়েছিল না হয়েছিল তাতো আর সবাই জানতে আসবে না। সবাই তোমাকে আমার ছেলের বউ বলেই জানবে।'

সুকৃতি মুখ নিচু করে বলল, 'আমি তো তাই মা।'

সরোজিনী বললেন, 'তাহলে হিন্দুর ঘরের রীতিনীতিগুলি ভালো করে মেনে চল। সিঁথিতে কপালে সিঁদুর পরো, আমি আজই শাঁখারীকে খবর দিচ্ছি। সধবা ঝি-বউদের হাতে শাঁখা না থাকলে কি মানায়?'

বেশটা যে পর্যাপ্তভাবে বদলানো হয়নি তা নজরে পড়ায় সুকৃতি একটু লজ্জিত হ'ল, কিন্তু সরোজিনীর নির্দেশ মত বেশ পরিবর্তনেও কি কম লজ্জা!

শেখর তা টের পেয়ে বলল, 'মা যা বলেছেন তা শোনাই ভালো, অনর্থক ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে—'

সুকৃতি একটু হেসে বলল, 'তাতো বটেই। আসলে কথাটা তো শুধু মার নয়, তাঁর ছেলেরও, কিন্তু দু'দিন আগেও যে তুমি বলতে সিঁদুর টিঁদুর তুমি পছন্দ কর না, বড় ন্যাস্টি মনে হয় তোমার কাছে—'

শেখরও হাসল, 'দুদিন আগে যা ছিলে এখন কি তুমি তাই আছ?'

অফিস থেকে ফিরে এসে শেখর দেখল, তার মার পছন্দ মতই সাজসজ্জা সব বদলে ফেলেছে সুকৃতি। পায়ে আলতা পরেছে, সিঁথিতে পুরু করে দিয়েছে সিঁদুরের দাগ, গাঢ় লাল রঙের শাড়ীতে অদ্ভুত রূপ খুলেছে সুকৃতির। কে বলবে ওর বয়স আঠার উনিশের বেশি?

শেখর হেসে বলল, 'বাঃ একেবারে চমৎকার গৃহলক্ষ্মী হয়ে রয়েছ দেখছি। আজ তো বৃহস্পতিবার এবার মা নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর পুঁথি খানা তোমার হাতে তুলে দেবেন।'

সুকৃতিও হাসল, 'তাহলে তোমার হাতেও ধান দুর্বা দিতে ভুলবেন না।'

হঠাৎ টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই সুকৃতি বলল, 'ভালো কথা তোমার একটা চিঠি আছে।'

'কোথাকার চিঠি?'

সুকৃতি মৃদুস্বরে বলল, 'বিমল-সংস্কৃতি-কেন্দ্রের।'

একটু যেন আটকে গেল গলা, একটু যেন আরক্ত হোল মুখ।

শেখর বলল, 'কই দেখি।'

কেন্দ্রের নামাঙ্কিত সাদা খামটা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিল সুকৃতি। শুধু শেখরের নাম নয়, সেই সঙ্গে সুকৃতির নামও টাইপ করা রয়েছে। সুকৃতি সোম! নামটা মনে মনে আর একবার উচ্চারণ করল শেখর। সুকৃতি সোম সোম, সোম, শব্দে এত মাধুর্য তা যেন আগে ওর জানা ছিল না।

খামের ভিতর থেকে চিঠি বের করল শেখর। সহকারী সম্পাদক, অধ্যাপক মুরারি মুখার্জি কর্মপরিষদের জরুরী সভা আহ্বান করেছেন, বিষয় কেন্দ্রের গঠনতন্ত্র। শেখরের মুখখানা গম্ভীর দেখাল।

সুকৃতি বলল, 'চা টা খেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। সাড়ে ছটা বাজল বলে।'

শেখর বলল, 'তা বাজুক গিয়ে। আমি আজ আর যাব না। কালকে একটা রেজিগ্‌নেশন্‌-চিঠি পাঠিয়ে দেব। তারপর চার্জটা একদিন বুঝিয়ে দিয়ে এলেই হবে।'

সুকৃতি চুপ করে থেকে বলল, 'এসব তুমি কি বলছ!'

শেখর স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'বলবার আর কি আছে সুকৃতি? কেন্দ্রে পরমায়ু আর কতদিন? দেখছিলে না, এরই মধ্যে আগন্তুক সভ্যদের সংখ্যা দিনের পর দিন কি রকমে কমে আসছিল। এর পর আমরা যদি সরে আসি কেন্দ্র কি আর দু'দিনও টিকবে?'

সুকৃতি স্বামীর দিকে একটু কাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'কিন্তু আমরা সরে আসব কেন?'

শেখর বিস্মিত হয়ে বলল, 'অবাক করলে। সরে না এসে করব কি? এর পরে কি ফের ওই বাড়ীতে, ওঁদের সঙ্গে কাজ করা যায়? বাঙলা দেশের অতটা সহ্যশক্তি নেই।'

সুকৃতি বলল, 'অন্ততঃ এক পক্ষের সহ্যশক্তি যে যথেষ্টই আছে, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি।'

শেখর স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ, পেয়েছি। কিন্তু কেন্দ্র তো সেই একজনকে নিয়েই নয়। তা ছাড়া তুমি আর আমি এই বেশে যদি তার চোখের সামনে দিয়ে রোজ নডাচডা করি তাঁর সহনশীলতার ওপর অত্যাচার করা হবে। তাঁর sentiment-এর কথাটাও আমাদের ভাবা উচিত।' শেখর তক্তপোষের ওপর বসে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তুমি ভালো করে বুঝে দেখ সুকৃতি, তুমি যা বলছ, এখানে তা সম্ভব নয়। পদে পদে ওঁদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আমাদের অস্থির করে তুলবে। ওঁরাও অস্বস্তি বোধ করবেন, আমরাও স্বস্তি পাব না। তার চেয়ে আমরা দূরে থেকে যতটা সাহায্য করতে পারি সেই ভালো। ওঁদের যদি উৎসাহ থাকে, শক্তি সামর্থ থাকে, বেশ তো, ওঁরা কেন্দ্রকে বাঁচিয়ে রাখুন। আর সংসারের কাজ সেরে তোমার যদি উৎসাহ থাকে, তাহলে দেশে তো ও ধরনের সভা-সমিতি লাইব্রেরী কালচার ক্লাবের অভাব নেই। প্যাগলামি কোরোনা সুকৃতি।'

একটু চুপ ক'রে থেকে সুকৃতি বলল, 'তোমার নিজের হাতে গড়া জিনিস। তার জন্য তোমার মায়া হয় না?'

সুকৃতির হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল শেখর, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'হয় বইকি, কিন্তু তার চেয়েও বেশি মায়া হয় তোমার জন্য। ভেবো না সুকৃতি, নিজের হাতে আমরা নতুন জিনিস গড়ে তুলব।'

সুকৃতি মুখ নিচু ক'রে বলল, 'তাহলে তুমি এত দিন আমার জন্যই—'

শেখর আবেগার্দ্র কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ তোমার জন্যই, আজ তা আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই সুকৃতি। তোমার জন্যই আমি ওসব করেছি। তোমার জন্য সব করা যায়।'

সুকৃতি আস্তে আস্তে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'যাই তোমার জন্য চা ক'রে নিয়ে আসি।'

চা আর খাবার খেয়ে শেখর হঠাৎ বলল, 'ভালো কথা। একটু বেরুতে হবে আমাকে। মিঃ নন্দীর সঙ্গে একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আছে।'

সুকৃতি বলল, 'তিনি কে?'

শেখর বলল, 'ন্যাশনাল পাবলিশিং কোম্পানীর চেয়ারম্যান। ওঁদের একজন পাবলিকেশন এডিটরের দরকার। খানিকটা কথাবার্তা ওঁদের সঙ্গে আগেও হয়েছে। যদি কাজটা হয়ে যায়, এখন যা মাইনে পাচ্ছি, তার দেড়গুণ বেশি ওখানে পাব। এতদিন যেভাবে চলেছে চলেছে। কিন্তু এখন তো আর ঠিক তেমন ক'রে চলতে পারে না। তোমার তো আর এত কষ্ট করার অভ্যাস নেই।'

সুকৃতি বলল, 'তা তো ঠিকই। কখন ফিরবে?'

শেখর বেরুতে বেরুতে বলল, 'বেশি দেরি হবে না। এই ঘণ্টাখানেক কি বড় জোর ঘণ্টা দেড়েক হ'তে পারে। তাড়াতাড়িই ফিরব।'

দেড় ঘণ্টা নয় ফিরতে প্রায় দু ঘণ্টার মতই লাগল শেখরের। মিঃ নন্দী তেমন ভরসা দিতে পারেননি। আরো কিছুদিন বাদে আর একবার খোঁজ নিতে বলেছেন। তাঁর কথাবার্তায় শেখরের মন প্রসন্ন হয়নি।

বাসায় ফিরে তার মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। সুকৃতি ঘরে নেই।

শেখর জিজ্ঞেস করল, 'ও কোথায় মা?'

সরোজিনী বিরক্ত স্বরে বলল, 'কি জানি বাপু। এই রাত করে ঘরের বউ কোথায় কেন্ কেন্নে না ফেন্নে বেরুল। তার কথার ওপর কথা বলবে কে। যেমন পাশ করা মেম সাহেব বউ এনেছ ঘরে,

তেমনি বোঝ মজা। মাত্র দু দিন বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যেই এই! কত দেখব। তখন পই পই করে নিষেধ করলাম। শেখর ওসবে কাজ নেই, ওসব কি আমাদের ঘরে পোষায়—'

আধ ঘণ্টা চুপ ক'রে বসে রইল শেখর। আর সরোজিনী সারাক্ষণ ছেলের নির্বুদ্ধিতার কথা বার বার উল্লেখ ক'রে নিজের কপালের দোষ দিতে লাগলেন। শহরে কি আর কোন মেয়ে ছিল না যে, তেইশ-চব্বিশ বছরের একটা ধাড়ী বিধবাকে—ছি ছি ছি। এক এক মিনিট যেন এক একটা যুগ। ন'টা বেজে গেল। তবু ফেরবার নাম নেই সুকৃতির। শেখর আর স্থির থাকতে পারল না, ক্রুদ্ধ, অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল।

সরোজিনী বললেন, 'তুই আবার যাচ্ছিস কোথায়?'

শেখর বেরুতে বেরুতে বলল, 'আসছি।'

হৃষীকেশ মৈত্রের বাড়ীর এক তলায় সেই বিমল-সংস্কৃতি-কেন্দ্র। কর্ম পরিষদের মিটিং খানিকক্ষণ আগে শেষ হয়েছে। সদস্যদের সবাই চলে গেছেন। লাইব্রেরী ঘরের কোণের দিকের টেবিলে কনুই চেপে গালে হাত দিয়ে গভীর ভাবনায় যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে রয়েছে সুকৃতি। পরনে সেই রক্তাম্বর, সিঁথিতে সেই সিঁদুর-শোভা। আশ্চর্য ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

শেখর আস্তে আস্তে ওর সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর রূঢ় স্বরে ডাকল, 'সুকৃতি।'

সুকৃতি যেন একটু চমকে উঠল, 'এই যে তুমি এসেছ।'

শেখর বলল, 'হ্যাঁ, আসতে হ'ল। কিন্তু আমার বারণ সত্ত্বেও তুমি কেন এভাবে চলে এলে?'

সুকৃতি বলল, 'কি করব বল? তুমি কাজের জন্য আসতে পারলে না। আমিও যদি না আসি ওঁরা কি ভাববেন। তা ছাড়া কর্মপরিষদের

কোন মিটিংএ আমরা দুজনে অনুপস্থিত হয়েছি, এমন তো কোন দিনই হয়নি। আজই বা কেন তা হবে?'

শেখর কি বলবে হঠাৎ তা ভেবে পেল না।

সুকৃতি বলল, 'আমি এসে পড়ায় গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে কোন কথাই আজ আর ওঠেনি। তোমার সেক্রেটারীগিরিও বজায় রয়েছে। আলোচনা যা হ'ল, তা সেই নৈশ বিদ্যালয়-সম্বন্ধে। অনেক গোলমালে প্রস্তাবটা এতদিন ধামাচাপা পড়ে ছিল। এবার কিন্তু তোমাকে উঠে পড়ে লাগতে হবে।'

শেখর স্ত্রীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি ঠাট্টা করছ সুকৃতি?'

সুকৃতি মাথা নেড়ে বলল, 'না, এতদিন সংস্কৃতি কেন্দ্র নিয়ে ভিতরে ভিতরে তুমিই ঠাট্টা করছিলে। কিন্তু এখন তো সেই ছদ্মবেশের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন তোমাকে তোমার নিজের নিজের বেশে দেখব, সত্যিকারের কাজের ভিতর দিয়ে পাব।'

'কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার চল।'

সুকৃতি উঠে দাঁড়াল।

দয়িতা

একই সহরে থাকা সত্ত্বেও যোগাযোগ, দেখাসাক্ষাতের অভাবে আমাদের এক সময়ের অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুই মন থেকে হারিয়ে যায়। এমন ভাবে হারায় যে, হারাবার দুঃখটুকু পর্যন্ত বোধ করি না। আবার এই সহরের রাস্তাতেই তাদের কারো কারো সঙ্গে হঠাৎ দেখাও হয়। কেউ কেউ শুধু ঘাড় নাড়ে কি জিজ্ঞেস করে, 'ভাল আছ?' বাঁধা জবাব দেই 'চলে যাচ্ছে।' তারপর যে যার পথে চলে যাই। সেদিন জয়ন্ত সেন কিন্তু অত সহজে চলে যেতে দিল না। সে রাস্তার মধ্যে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'এই কাছেই আমার মেস, চল কল্যাণদা, আস্তানাটা একবার দেখে যাবে।'

বললুম, 'এই বিকেল বেলায় কি ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগবে? তার চেয়ে চলনা, কলেজ স্কোয়ার দিয়ে একটু ঘুরে বেড়াই কি কোন চায়ের দোকানে গিয়ে বসি।'

জয়ন্ত বলল, 'কোনটাই কথা বলবার মত জায়গা নয়। তার চেয়ে মেসটাই বরং একটু নিরালা হবে। চল, বেশিক্ষণ তোমাকে আটকে রাখব না। খানিক বাদে আমাকেও বেরুতে হবে।'

কানাই ধর লেনের একটা পুরোন মেস-বাড়ির দোতলায় পুব-দক্ষিণ কোণের ছোট একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। সারি সারি দু'খানা তক্তপোষ, একখানার ওপর বিছানা গুটানো। বুঝলুম এটি জয়ন্তের অনুপস্থিত রুম-মেটের।

শিয়রের দিকে একটা র‍্যাক। তাতে কিছু বই-পত্র। আমি নেড়ে-চেড়ে দেখতে যাচ্ছিলাম, জয়ন্ত বাধা দিয়ে বলল, 'বই পরে দেখ। কেমন আছ তাই বল।'

বললুম, 'ভাল আছি।'

তারপর একটু বাদে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার কি খবর?'

জয়ন্ত বলল, 'খবর তো দেখতেই পাচ্ছ। যথাপূর্বং। একটা পাবলিশিং কোম্পানীতে চাকরি করি। মেস-খরচা বাদে যা থাকে শান্তিপুরে বাপ-মাকে পাঠিয়ে দেই।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'বাপ মা'র পুত্রবধূটি এসেছেন না কি?'

জয়ন্ত মৃদু হাসল, 'না, তিনি এখনো অনাগতা।'

বললুম, 'তাকে এবার এনে ফেললেই পারো। আর দেরি করে লাভ কি?'

জয়ন্ত বলল, 'লাভ অবশ্য নেই, কিন্তু বড় ঝামেলা, বিয়ে করার চাইতে বন্ধু-বান্ধবের বিয়েতে বরযাত্রী যাওয়া, বিয়ের পরে তাদের বিবাহ-বার্ষিকীতে নিমন্ত্রণ খাওয়াটা বেশ আরামের। আজও একটা ম্যারেজ এ্যানিভারসারির নিমন্ত্রণ আছে।'

বললুম, 'সবান্ধবে না কি? তা হলে বল সঙ্গী হই।'

'সঙ্গী না হয় হলে। কিন্তু কি দেওয়া যায় বলতো। মাসের দশ তারিখ হোল, এখনো মাইনে পাইনি। পকেট গড়ের মাঠ। আর ঠিক সময় বুঝে আজই পড়ল কি না ওদের বিবাহ-বার্ষিকী।'

বললুম, 'তারা কে?'

জয়ন্ত আমার কথার জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'যাক গে, খালি হাতেই যাব। কিছু নিয়ে যাওয়ার চেয়ে খালি হাতে গেলেই বরং সেখানে মানাবে ভালো।'

আমি কিছু না বলে পূবের দেয়ালের দিকে তাকালাম। সাধারণ একটি আয়না, গোটাদুই আধ-ময়লা পাঞ্জাবি ঝোলানো। মাঝখানে একটি সোয়েটার, ছাই রঙের দামী উলে বোনা, ডিজাইনটি বেশ চমৎকার।

একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, 'আরে, আষাঢ় মাসের এই ভ্যাপসা গরমে তুমি দেখি শীতের পোষাক বের করে ফেলেছ?'

জয়ন্ত যেন একটু চমকে উঠল, তারপর কৈফিয়তের ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি বলল, 'রোদে দেওয়ার জন্য বের করেছি। স্যুটকেসটায় ড্যাম্প লেগে গিয়েছিল। কাপড়-চোপড় সব নষ্ট হওয়ার জোগাড়, সোয়েটারটা মনের ভুলে বাইরে রয়ে গেছে দেখছি।'

উঠে গিয়ে আলনা থেকে পেড়ে আনলুম সোয়েটারটা। একটু নেড়ে-চেড়ে দেখে বললুম, জিনিসটা কিন্তু বেশ ভালো, ডিজাইনটি সুন্দর! বাজারের কেনা বলে মনে হচ্ছে না।'

জয়ন্ত আমার দিকে তাকাল, 'না, ওটা একজনের দেওয়া।' তারপর একটু বাদেই হঠাৎ বলে উঠল, 'আচ্ছা কল্যাণদা, এই সোয়েটারটা উপহার দিলে কেমন হয় ওদের? আমি মাত্র একটা সিজন ব্যবহার করেছি।'

হেসে বললুম, 'তা ষ্টাণ্টটা নেহাৎ মন্দ নয় না। গরমের দিনে শীতের পোষাকটা খুবই চমকপ্রদ হবে। বিশেষ করে সম্পর্কটা যদি রসিকতার হয়—'

জয়ন্ত বলল, 'হ্যাঁ সম্পর্কটা প্রায় সেই রকমেরই।'

বললুম, 'আভাসে-ইঙ্গিতে না সেরে ব্যাপারটা আর একটু যদি খুলে বলতে সস্তায় উপযুক্ত উপহার বাৎলে দিতে পারতুম।'

জয়ন্ত বলল, 'খুলে বলবার আর কি আছে? একটু বসো, চায়ের কথা বলে আসি।'

আপত্তি করলুম না। চায়ের দরকার ছিল। জয়ন্ত সিগারেটও আনাল। আমি একটু আপত্তি করতে প্রায় জোর করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'আহা, ধরাও, এক-আধটা খেলে জাত যাবে না।'

নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বলল, 'খুলেই বলব। তবু এক-আধটু ইসারা ইঙ্গিত যদি থাকে নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি হবে না।'

বললুম, 'না, আপত্তি আর কি।'

মিনিট পাঁচেক চুপ করে থাকবার পরে জয়ন্ত হঠাৎ সুরু করল:

ম্যাঙ্গো লেনে ন্যাশনাল পাবলিসিটি ফোরাম বলে একটি মাঝারি ধরনের অফিস আছে জানো বোধ হয়? বিজ্ঞাপন জোগাড় করা তাদের ব্যবসা, কারবারটা জমকালো নয়। কোন রকমে কায়কষ্টে চলে। কষ্টের বেশির ভাগই ভোগ করে কেরাণীরা। সময় মত মাইনে পায়না। কোন কোন সময় পাট পেমেণ্টে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সেই অফিসে একই টেবিলে মুখোমুখি বসে কপি লেখে গৌতম দে আর শ্যামল সরকার। কপি লেখে আর নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়ে আলোচনা করে দু'জনের একই বয়স—এই ধরো সাতাশ-আটাশ। প্রায় একই ধরনের বিদ্যা-বুদ্ধি-শক্তি-সামর্থ। বছর সাত-আট আগে দু'জনেই বি-এ পাশ করেছে, তারপর আর কিছু করতে পারেনি। এ-অফিস সে-অফিস ঘুরে, মাঝে মাঝে বেকার থেকে শেষ পর্যন্ত দুজনে ঢুকেছে পাবলিসিটি ফোরামে। শ্যামল মাস তিনেক আগে, গৌতম তিন মাস পরে। কিন্তু মাইনে দু'জনেরই এক, মাগ্‌গীভাতা নিয়ে সোয়াশ। দু'জনেরই পোষ্য অনেক। বুড়ো বাপ-মা, গুটি তিন চার ক'রে ছোট ছোট ভাই-বোন। তাদের ভরণ-পোষণের কথা দু'জনকেই ভাবতে হয়। সাহায্য করতে হয় বুড়ো বাপকে। মাসখানেক মুখোমুখি বসতে না বসতে এদের প্রায় গলায় গলায়

বন্ধুত্ব হয়ে গেল, কলেজী বন্ধুত্বও যেন এত ঘনিষ্ঠ হয় না। শিল্প, সাহিত্য, রাষ্ট্র, সমাজ সম্বন্ধে দু'জনের মতামত মোটামুটি এক। যেটুকু অনৈক্যের ভঙ্গি করে সেটুকু শুধু তর্ক করার জন্যে। আর ফাঁক পেলেই তারা ওই সব বিষয় নিয়ে তর্ক করে আলাপ করে। সংসারের থোড়-বড়ি-খাড়াকে ভুলে থাকবার আর কি পথ আছে?

তারপর এত সাদৃশ্য, এত ঐক্যের মধ্যেও একদিন ধরা পড়ল তারা কত আলাদা, তাদের বিভিন্নতা কত বেশি। এ আবিষ্কারটা অবশ্য একদিনে হয়নি। হয়েছে অনেক দিন বসে। তবু নমুনা হিসাবে প্রথম দিনের কথাটা বলি।

টিফিনের পর হোড় কোম্পানীর একটা তেলের বিজ্ঞাপন রচনায় রবীন্দ্রনাথের কোন জুৎসই লাইন জুড়ে দেওয়া যায় কি না গৌতম বসে বসে চিন্তা করছে, হঠাৎ একটি মিষ্টি গলার আওয়াজে তার মনোযোগ ভেঙে গেল, 'দেখুন, শ্যামল কি এখানে বসে? শ্যামল সরকার?'

গৌতম চোখ তুলে তাকাল, শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে চেহারার একটি মেয়ে। কেবল মুখের কথায় যে মিষ্টি তা নয়, মুখের গড়নটুকুও তাই। খুটিনাটি বিচার ক'রে সুন্দরী তাকে বলবার জো নেই, স্বাস্থ্যবতীও নয়, সারা চোখে-মুখে কেমন একটা করুণ বিষণ্ণতার ছাপ। কিন্তু তাতে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য একেবারে চাপা পড়েনি। শাড়িটা আটপৌরের সামান্য এক ধাপ উপরে। আভরণ বলতে কিছু নেই। হাত, গলা, কান সব একেবারে খালি। যাকে বলে একেবারে যৌবনে যোগিনী মূর্তি। কিন্তু সে মূর্তি তবু মনকে টানে, চোখকে ধরে রাখে।

মেয়েটি বলল, 'ও বুঝি আসেনি আজ?'

গৌতম এবার সচেতন আর সবাক হয়ে উঠে বলল, 'না না, এসেছে। বসুন আপনি। পাশের ঘরে গেছে ফোন করতে। এক্ষুনি এসে পড়বে।'

মেয়েটি শ্যামলের খালি চেয়ারে বসল।

গৌতম ফের তেলের বিজ্ঞাপনে মনোযোগ দিল। কিন্তু যোগ্য কথা কিছুতেই মনে পড়ল না। মিনিট দু'তিন বাদে মুখ তুলে ফের তাকাল মেয়েটির দিকে। কৈফিয়তের সুরে বলল, 'শ্যামলের কাণ্ড দেখুন। সেই যে ফোন করতে গেছে আর ফেরার নাম নেই। আপনি বসুন। আমি বরং বেয়ারাকে দিয়ে খবর দেই।—' বলে কলিং বেলটা টিপতে গেল গৌতম। কিন্তু মেয়েটি মৃদু বাধা দিয়ে বলল, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি অপেক্ষা করছি। আজ কাল ফোন করতে যা হাঙ্গামা, সহজে কানেকসন্ পাওয়া যায় না। আমি দু'দিন চেষ্টা করেও আপনাদের নম্বর পাইনি।'

গৌতম বলল, 'বাইরের কোন নম্বর চাইলে আমাদেরও ওই একই দুরবস্থা হয়। পারতপক্ষে আমি ফোনের কাছে যাইনে। শ্যামলকেই পাঠাই। কিন্তু তাতেও যে খুব সুবিধা হয় তা নয়, শ্যামল গিয়েই ফোন-অপারেটরদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, তারাও দিন ভরে তার শোধ নেয়। সারাদিনের মধ্যে অফিস শুদ্ধ, কাউকে একটা নম্বর দেয় না।'

মেয়েটি বলল, 'তাই নাকি? ঝগড়া করার অভ্যেসও হয়েছে না কি ওর? আগে তো কারও মুখেরদিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারত না।'

গৌতম বলল, 'এখনো পারে না। কিন্তু ফোন-গার্লদের সঙ্গে ঝগড়া করায় ওই এক সুবিধে। তাদের মুখের দিকে তাকাবার দরকার হয় না।'

মেয়েটি এবার শব্দ ক'রে হাসল।

আশে পাশের সহকর্মীরা অনেকেই সে শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। কিন্তু গৌতম ভ্রূক্ষেপ করল না। মেয়েটিরও চোখ গেল না সেদিকে।

গৌতমের মনে হোল হাসির এমন মধুর ভঙ্গি অনেকদিন দেখেনি, এমন মধুর ধ্বনি অনেকদিন শোনেনি।

অফিসের মধ্যে এমন করে হেসে ওঠায় মেয়েটি বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে থাকবে। হয়তো সেই জন্যই গৌতমের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল।

ঠিক এই সময়ে শ্যামল এসে টেবিলের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর বিস্মিত হয়ে বলল, 'অর্চনাদি! আপনি যে? কবে এলেন এলাহাবাদ থেকে?'

অর্চনা বলল, 'অনেকদিন। প্রায় পনের দিন হোল, তারপর, ফোন করতে পারলে, না কি কেবল ঝগড়া করেই ফিরে এলে?'

শ্যামল বলল, 'ঝগড়া আবার কিসের?'

অর্চনা ইঙ্গিতে গৌতমকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি বলছিলেন, তুমি নাকি ঝগড়াতে খুব ওস্তাদ হয়েছ। সত্যি না কি?'

শ্যামল একটু হেসে গৌতমের দিকে তাকাল, 'তোমাদের আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে তাহলে?'

গৌতম বলল, 'আলাপ হয়েছে, পরিচয় আর হোল কই। তবে তুমি আর একটু দেরি ক'রে এলে নিজের পরিচয় আমি নিজেই দিতাম। কারো introduction-এর অপেক্ষায় থাকতাম না।'

তারপর অর্চনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানেন, আমার এই এক বদ অভ্যেস। সহরে আদব-কায়দা মোটেই দুরস্ত করতে পারিনি। যখন-তখন বাজখাঁই আওয়াজে হাঁক ছাড়ি 'অয়মহং ভো।'

অর্চনা হেসে বলল, আপনি অযথা বিনয় করছেন। আপনার আওয়াজ মোটেই বাজখাঁই নয়।' তারপর শ্যামলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে, বোসো।'

চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল অর্চনা।

শ্যামল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না না, আপনি বসুন।'

অর্চনা বলল, 'তোমার চেয়ারে আমি গ্যাঁট হয়ে বসে থাকব, আর তুমি বুঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করবে?'

গৌতম বলল, 'কাউকেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আমাদের অফিসে আর কিছু না থাক, ফার্ণিচারের অভাব নেই। আপনি সুস্থ হয়ে বসুন, শ্যামলের জন্যে আলাদা চেয়ার আনাচ্ছি।'

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে গৌতম আর একখানা চেয়ার এনে দিতে বলল।

তারপর থেকে এই তৃতীয় চেয়ারখানা দু'চারদিন বাদে বাদে প্রায়ই আনতে হোত গৌতমকে। অর্চনার সম্প্রতি চাকরি-বাকরি কিছুই নেই। কাজ খুঁজছে। অফিস অঞ্চলে প্রায়ই আসতে হয়। আর সেই উপলক্ষে খোঁজ নিয়ে যায় শ্যামলের।

দিন কয়েক বাদে একদিন গৌতম শ্যামলকে জিজ্ঞেস করল 'অর্চনা দেবী কি তোমার ক্লাসফ্রেণ্ড? একসঙ্গে পড়েছ?'

শ্যামল বলল, 'না, উনি আমার দু'বছরের সিনিয়র। আমি যেবার ইণ্টারমিডিয়েট দেই সেবার উনি বি-এ দিলেন। বয়সেও বছর দু-তিনেকের বড।'

গৌতম বলল, 'তাই না কি? দেখলে তো তা মনে হয় না। তোমার অর্চনাদি নিজের বয়স থেকে বেমালুম বছর চার-পাঁচ চুরি করে, মেরে দিতে পারেন। পাকা ডিটেক্‌টিভের সাধ্য নাই ধরে।'

শ্যামল কোন জবাব না দিয়ে নিজের মনে কাজ করে যেতে লাগল।

গৌতম বলল, 'যাই বল, এই রকমই কিন্তু আমার সব চেয়ে ভালো লাগে।'

শ্যামল বলল, 'কি রকম?'

গৌতম বলল, 'এই ধর বর্ণচোরা আম, মুখচোরা শয়তান, আর আর বয়সচোরা চেহারা—তিনটিই খুব উপাদেয়।'

শ্যামল গম্ভীর হয়ে বলল, 'দেখ, ওঁর সম্বন্ধে এ ধরনের হালকা আলাপ-আলোচনা আমার বড় খারাপ লাগে। ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি সে কথা মনে রেখ।'

গৌতম বলল, 'তা তো করবেই। আচ্ছা, অর্চনা দেবী তোমাকে এক সময় নাকি পড়াতেন, সত্যি না কি? সেদিন বলছিলেন?'

শ্যামল একটু আরক্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ পড়াতেন, তাতে কি কি হয়েছে। নিজে উনি খুব ভালো ছাত্রী ছিলেন। শুধু লেটার নয়, রেকর্ড মার্ক পেয়েছিলেন লজিকে।'

গৌতম বলল, 'হু। তুমি তাহলে ওঁর কাছে ন্যায়শাস্ত্র পড়েছ।' তারপর খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে শ্যামলের প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, সত্যি করে বল তো, সেই সঙ্গে অন্যায় শাস্ত্রের দু-এক পাতা উনি কি পড়িয়ে দেন নি?'

শ্যামল আরক্ত মুখে বলল, 'গৌতম তুমি যদি ভদ্রভাবে ওঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে না পারো, তাহলে ওঁর সম্বন্ধে কোন আলোচনারই তোমার দরকার নেই।'

এরপর অর্চনার সম্বন্ধে আরো কিছু কিছু কথা শ্যামলের কাছ থেকে ভদ্রভাবেই জেনে নিল গৌতম। এত বয়স অবধি কেন বিয়ে করেনি অর্চনা, এ প্রশ্নের জবাবে শ্যামল যখন বলল যে, জীবনে সে খুব নিদারুণ আঘাত আর গভীর দুঃখ পেয়েছে তখন সেই দুঃখ আর আঘাত সম্বন্ধে কোন দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না গৌতম। কিন্তু সবই অনুমান করল।

এলাহাবাদে অর্চনা একটি স্কুলে মাষ্টারী করত। কিন্তু স্বাস্থ্য না টেকায় কাজ ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছে। কিন্তু কাজ

ছাড়া বেশি দিন থাকবার তার জো নেই। কলকাতায় গড়পারের বাসায় বুড়ো বাবা আছেন, বিধবা কাকীমা আছেন, আছে দুটি ছোট খুড়তুতো ভাই-বোন। পাকিস্তানের বাড়ি-ঘর ফেলে সব এখানে এসে বাসা বেঁধেছে। শুধু বাবার ওপর নির্ভর করে চলে না। নিজের ভাবনা ছাড়াও সংসারের ভাবনা ভাবতে হয় অর্চনাকে।

গৌতম বলল, 'সকলেরই ঠিক একই সমস্যা। প্রত্যেকে একেবারে এক ছাঁচে ঢালাই। কি করবেন ভেবেছেন ?'

অর্চনা বলল, 'হাতের কাছে যা পাই, বাছাই করবার কি আর জো আছে!'

কিন্তু টুইশান ছাড়া হাতের কাছে কিছু জুটল না। গৌতম হঠাৎ একদিন পরামর্শ দিয়ে বসল, 'এক কাজ করুন না। মাঝে মাঝে আসছেন তো আমাদের অফিসে। বিজ্ঞাপনের কাজ শিখুন না রোজ ঘণ্টাখানেক করে ?'

অর্চনা বলল, 'বিনে মাইনেয় ?'

গৌতম বলল, 'হ্যাঁ শেখার সময় মাইনে দিতে হবে না আপনাকে।'

শ্যামল ঘাড় নেড়ে বলল, 'কি যে বল। এখানে এসে উনি কি কি করবেন ? কি প্রসপেক্ট আছে এখানে ?'

গৌতম বলল, 'এই উপলক্ষে অন্তত দেখা-সাক্ষাৎ তো হবে। খানিকটা সময় তো কাটবে।'

দেখা গেল, গৌতমের কথাটাই অর্চনার মনে ধরল। ম্যানেজারকে বলে যৎসামান্য একটা এ্যালাউন্সের ব্যবস্থাও ক'রে দিল গৌতম। বিকেলের দিকে অর্চনা রোজ একবার করে আসতে লাগল।

একদিন অর্চনা বলল, 'এত তোড়জোর ক'রে ডেকে আনলেন কিন্তু কাজ তো কিছু শেখাচ্ছেন না?'

গৌতম বলল, 'সর্বনাশ করেছেন। আমি নিজে কি কোন কাজ জানি যে শেখাব? কথাটা অবশ্য ম্যানেজারের কানে গিয়ে লাগাবেন না। দোহাই আপনার।'

অর্চনা হেসে বলল, 'তা না হয় না লাগালুম। কিন্তু কাজ না জেনে কাজ করেন কি করে? অসুবিধে হয় না?'

শ্যামল বলল, 'কেবল অসুবিধে? ইনচার্জের কাছে দিন-রাত বকুনি খায় গৌতম। ওর কথা আর বলবেন না।'

গৌতম হেসে বলল, 'তাতে আমার লজ্জা নেই অর্চনা দেবী। সংসারে দুই জাতের মানুষ আছে। কাজের মানুষ আর কথার মানুষ। আর মজা এই, কাজের মানুষের কাছে কথার মানুষেরা চিরকালই ঘাড় হেঁট করে কথা শোনে। সে কথা মধুর কথা নয়। কিন্তু কথার মানুষেরা তার বদলে যে সব কথা শোনায় তা রসমধুর।

শ্যামল বলল, 'কিন্তু সংসারে কাজের মানুষ না থাকলে কোথায় বা থাকত তোমাদের রস আর কোথায় বা থাকত মাধুর্য।'

গৌতম কোন জবাব দিল না। কাজকে বড় ভয় করে গৌতম। আর সেই জন্যে কাজের মানুষ শ্যামলকে তার একটু খাতির ক'রেও চলতে হয়। অনেক সময়েই গৌতমের অর্ধেক কাজ শ্যামল ক'রে দেয়। গৌতম কোন রকমে এড়িয়ে যেতে পারলে, পালিয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। শ্যামল মুখে রাগ করে, ধমকায়, পরিণামের ভয় দেখায়, কিন্তু একটু একটু প্রশ্রয়ও দেয় আবার বন্ধুকে। গৌতমের মধ্যে একটি শিল্পী মন আছে। গৌতম এক-আধটু গান গাইতে পারে, অবশ্য গান গাওয়ার চেয়ে গান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার দিকেই

তার ঝোঁক বেশি। কলম দিয়ে লেখার চেয়ে স্কেচ আঁকাতেই ওর বেশি উৎসাহ। সাহিত্য চর্চার সখও গোড়ায় এক-আধটু ছিল। এখন সেটা দাঁড়িয়েছে সাম্প্রতিক সাহিত্যের সমালোচনায়। তার জন্য কলমের দরকার হয় না। গৌতমের জিভই যথেষ্ট। বিদেশী দামী কলমের যে কোন নিবের চেয়ে তা সূচি-তীক্ষ্ণ।

শ্যামল মাঝে মাঝে বলে, 'এত যদি তোমার বিদ্যে বুদ্ধি, নিজে লিখলেই তো পারো।'

গৌতম জবাব দেয়, 'কে অত পরিশ্রম করে বল। কোদাল কোপানো, হাতুড়ী পেটানোর মত কলম চালানো, তুলি বোলানোও আসলে শ্রমিকের কাজ। কিন্তু আমি তো শ্রমিক নই, পাঁতি বুর্জোয়াও নই, একেবারে জাত জমিদার। পূর্বপুরুষের জোতজমি অবশ্য দু'পুরুষ আগে শেষ হয়েছে কিন্তু সাত পুরুষের জমিদারী মেজাজটা আমি জিইয়ে রেখেছি।'

এসব আলোচনা অর্চনার সামনেই হয়। গৌতমের কথা-বার্তা অর্চনা যে উপভোগ করছে তা ওর বুঝতে বাকি থাকে না, সেই শ্যামবর্ণ বিষণ্ণ মুখে কি করে যে কথার বিচিত্র রঙ লাগে, ক্লান্ত, নৈরাশ্য নিষ্প্রভ চোখ দু'টি কি করে ফের উৎসাহউজ্জ্বল হয়ে ওঠে তা লক্ষ্য করে নিজেও আনন্দ পায় গৌতম। ক্রমে আরো পরিবর্তন তার চোখে পড়ে। শুধু যে ঠোঁটের রঙ, চোখের রঙ বদলে যাচ্ছে অর্চনার তাই নয়, ওর শাড়ির রঙও নিত্য না হোক সপ্তাহে দু'তিনবার করে বদলাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে খোঁপা বাঁধার ঢঙ। আবরণে আভরণে যোগিনী ফের মনোযোগিনী হয়েছে। গলায় চিকন হার উঠেছে, হাতে কাঁকন. কানে পরে আসে কোনদিন লাল পাথরের ফুল, কোন দিন বা কানবালা।

একদিন কাজের ফাঁকে পি, সি, চৌধুরীর যাদুবিদ্যার দক্ষতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি না কি পলকে পলকে নিজের চেহারা বদলে ফেলতে পারেন। গৌতম অর্চনার দিকে তাকিয়ে ফস্ করে বলে ফেলল, 'সে রকম যাদুবিদ্যায় আপনিই বা কম যান কিসে? যাই বলুন, রূপান্তরের ব্যাপারে যাদুকরদের সাধ্য নেই যাদুকরীদের সঙ্গে পাল্লা দেয়। একটু খানি শাড়ীর রঙ বদলে তারা গোটা পৃথিবীর রঙ বদলায়, তেমন পরিবর্তন পুরুষের জন্মান্তরেও হয় না।'

অর্চনা লজ্জিত হয়ে চোখ নামাল। শ্যামল কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে গৌতমের দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের সুরে বলল, 'আচ্ছা, গৌতম, তোমার মুখে কি ওই সব কথা ছাড়া আর কথা নেই?'

গৌতম অপরাধ কবুল করার ভঙ্গিতে বলল, 'না বন্ধু, আমার সব কথাই ওই কথায় ঢেকে যায়।'

শ্যামল রাগ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল। একটু আগে কি একটা জরুরী কাজে ম্যানেজার তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

অর্চনা অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি তো জানেন, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি। ওর সামনে ঠিক ওই ধরনের ঠাট্টা-তামাসাগুলি আর করবেন না।'

গৌতম সায় দিয়ে বলল, 'আচ্ছা. এরপর ওর আড়ালেই করব।'

গৌতম আর শ্যামল সমবয়সী বন্ধু হলে কি হবে, অর্চনা যে দুজনের সঙ্গে ঠিক একরকম সম্পর্ক রাখতে চায় না, কিংবা চাইলেও পারে না তা গৌতম টের পেয়েছিল। আর টের পেয়ে তার উৎসাহের অন্ত ছিল না। তারপর শ্যামলের সামনে ওই ধরণের ঠাট্টা-তামাসার অসুবিধে হয় বলে ওরা আড়াল খুঁজতে লাগল। কোন দিন বা রাস্তার ভিড়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে, কোন দিন বা যাত্রীবহুল

ট্রাম-বাসে পাশাপাশি বসে, কখনো বা গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ওরা সেই নিবিড়তার স্বাদ পেল, মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ বাস থেকে নেমে পড়ে ওরা এক অপরিচিত চায়ের দোকানে গিয়ে উঠত, হাতল-ভাঙা কাপে চা খেয়ে অখ্যাত সরু গলি-ঘুঁজি পেরিয়ে এক একটি অজ্ঞাত অবজ্ঞাত পার্ক আবিষ্কার করত। সে সব পার্ককে রম্যোদ্যান বলা যায় না। অন্য কোন প্রণয়ী যুগলের যে সেখানে পা পড়েছে তা সেই সব মরূদ্যানের চেহারা দেখলে বিশ্বাস হয় না। তাতে না ছিল লতা বিতান, না ছিল ছায়াতরু। কিন্তু তাই বলে আলাপ-আলোচনা গুঞ্জরণের বিরাম ছিল না।

মাস খানেক পরে শ্যামল একদিন বলল, 'তুমি কি ওঁকে তুমি বলতে সুরু করেছ নাকি?'

গৌতম বলল, 'জানই তো, আমি বেশিদিন কাউকে আপনি বলতে পারি নে। তোমাকে তিন দিনের দিন তুমি বলেছিলাম, অর্চনাকে তবু তিন মাস সময় দিয়েছি।'

শ্যামল একথা শুনে মুখ আরো গম্ভীর করল। তারপর দু-তিন দিনের মধ্যে গৌতম কি অর্চনার সঙ্গে কোন কথাই বলল না। গৌতম ওর ভাব দেখে মনে মনে হাসল আর ভাবল, শ্যামলের এত হিংসার কি কারণ থাকতে পারে। গৌতম জিজ্ঞেস করে জেনেছে অর্চনা না কি ওর দূর-সম্পর্কের দিদি। অবশ্য প্রায় সমবয়সী দিদিরা যত দূর সম্পর্কের হয় তাদের কাছে যাওয়ার সুবিধা, কাছে যাওয়ার আনন্দ তত বেশি। কিন্তু সম্পর্কের দূরত্ব ঘুচাবার মত ছেলে তো শ্যামল নয়, বা এ সব ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ কি নৈপুণ্য আছে বলেও মনে হয় না। শ্যামল যত পারে তার অর্চনাদিকে শ্রদ্ধা করুক, তার বিদ্যা আর বিদগ্ধতার প্রশংসা করুক। অর্চনা ওর কাছে

অর্চিতা হয়ে এখনো যেমন আছে তেমনি থাকুক চিরকাল। গৌতম তো তাতে বাদ সাধতে যাচ্ছে না। বন্ধুর শ্রদ্ধা-নিবেদনের সরিক তো হচ্ছে না গৌতম? কাড়াকাড়ি করছে না পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে। তবু শ্যামলের এত দুঃখ কিসের?

অবশ্য শ্যামলের দুঃখ যে গৌতম একেবারে না বুঝত তা নয়, ওর অর্চনাদিকে ওরই সমবয়সী বন্ধু শ্রদ্ধার উঁচু আসন থেকে হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টানে হাত ধ'রে টেনে নামিয়েছে। এ যদি দাঁড়ি-গোঁফওয়ালা অন্য কোন বয়স্ক লোক হোত, যদি এম, এ, পি, আর, এস, কি পি, এইচ, ডি, উপাধিধারী কেউ হোত, কিংবা আজকাল শৌর্য-বীর্য-পৌরুষের প্রতীক যে বিত্ত তা যদি থাকত লোকটির, যদি গাড়ি-বাড়িওয়ালা বিরাট ধনী হোত শ্যামলের অর্চনাদির প্রেমাস্পদ, তা হলেও না হয় ওর একরকম সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু তা তো নয়; গৌতমও অর্চনার চেয়ে শ্যামলের মতই বয়সে ছোট, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীতে ছোট, কৌলীন্যে ছোট, অবস্থায় ছোট—বড়র মধ্যে কেবল ওর কথাগুলি। সেই কথার ফলকে ওর অর্চনাদি এমন ক'রে গাঁথা পড়ল কি ক'রে। পঞ্চশরে বিদ্ধ হওয়ার যে আনন্দ সে সময় শ্যামলের অর্চনাদি তা পুরোপুরিই পাচ্ছিল, কিন্তু এক শরবিদ্ধ পাখীর মত যন্ত্রণায় ছটফট করছিল শ্যামল।

দুঃখের আরো কারণ ছিল শ্যামলের। এর আগে প্রেম সম্পর্কে যে দুঃখকর অভিজ্ঞতা অর্চনাদির হয়েছে তা শ্যামল জানত। অর্চনা যখন সবে এম-এ পাশ ক'রে বেরিয়েছে তখন এক ধনবান বিদ্বান রূপবান পুরুষরত্ন অর্চনার হাত ধরেছিল। তার পর সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় সে হাত ছেড়ে দিতে হোল। যাওয়ার সময় বলল, 'আমাদের এ ছাড়াছাড়ি বেশিদিনের নয়, ভাবছ কেন।' অসিত

তালুকদার কথা রাখল। বছর দুই বাদেই ফিরে এল দেশে, কোন শ্বেতাঙ্গিনীর হাত ধ'রে যে এল তাও নয়। কিন্তু অর্চনা দেখল সামান্য এই স্থানকালের ব্যবধানে দু'জনের মধ্যে বড় এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করেছে। অসিত তালুকদার অনেক নতুন অভ্যাস, নতুন রকম আচার-আচরণ নিয়ে এসেছে বিদেশ থেকে। অর্চনা তা কিছুতেই রপ্ত করতে পারল না, সহ্য করতে পারল না, চলতে লাগল খিটিমিটি আর মান-অভিমানের পালা। অসিত বিরক্ত হয়ে তাদের মতই অভিজাত ঘরের এক গৌরাঙ্গিনীর হাত হাতের মুঠিতে নিয়ে আগের পালা শেষ করল। অর্চনা ধরল বৈরাগিনীর বেশ। কলকাতার বাইরে বাইরে চাকরি নিয়ে বেড়াতে লাগল। ছুটি ছাটায় দেখা হোত শ্যামলের সঙ্গে। শ্যামল বলত, 'আপনি তার জন্য এত দুঃখ পাচ্ছেন কেন অর্চনাদি। সে তো আপনার এই দুঃখের যোগ্য নয়।'

অর্চনা জবাব দিত, 'তুমি ছেলেমানুষ শ্যামল। ওসব কথা বুঝবার এখনো বয়স হয় নি। প্রেমের পারমার্থিক সত্তা নিজের মনে। তা অশরীরী। সেখানে দোষ-গুণ যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিতান্তই বাইরের বস্তু। আমার কাছে ওর ভাব রূপটাই একমাত্র রূপ।'

এই দার্শনিক ধমকে ভয় পেয়ে শ্যামল চুপ করে থাকত। ভয়ের চেয়ে বেশি হোত ওর শ্রদ্ধা। অর্চনাদি ওরও কাছে ছিল সেই ভাবের বিগ্রহ।

কিন্তু উপগ্রহের মত কোত্থেকে এসে জুটল গৌতম। উড়ে এসে জুড়ে বসল। সে বিগ্রহের পায়ে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিল না, পঞ্চপ্রদীপে আরতি করল না, শ্যামলের দেবী-প্রতিমাকে ছোট্ট পুতুলের মত নাচাতে লাগল, খেলাতে লাগল।

শ্যামলের আর সহ্য হোল না, বন্ধুকে একদিন বলে বসল, 'দেখ গৌতম, সব কিছুরই একটা সীমা আছে। তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ।'

গৌতম বলল, 'দেখ শ্যামল অর্চনা যদি তোমার শ্রদ্ধেয়া হয়, সেই সুবাদে আমিও তোমার পূজনীয়, শ্রদ্ধাস্পদ, আমার সঙ্গে বুঝে সমঝে কথা বোলো। কোন অশাস্ত্রীয় আচরণ করো না।'

শ্যামল হঠাৎ বড় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, রাগে জ্বলে উঠল ওর চোখ, বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হয়।'

গৌতম রাগ করল না, হেসে বলল, 'বন্ধ, ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়। এ-ও তোমাদের শাস্ত্রেরই কথা। সে শাস্ত্র মনুসংহিতায় নয়, রসসংহিতায়।'

শ্যামল আর জবাব দিল না। মাথা নিচু ক'রে বিজ্ঞাপনের কপি লিখতে লাগল। পাল এণ্ড সন্স-এর কড়াই বালতি যে বাজারের সব চেয়ে সেরা জিনিষ, বহু ব্যবহারেও তার ক্ষয় নেই—মনোরম ভাষায় ক্রেতাদের একথাটা বুঝিয়ে দেওয়ার ভার পড়েছে তার ওপর।

কিন্তু শ্যামল অযথা রাগ করছিল। গৌতমের একার সাধ্য কি প্রতিমাকে পুতুল বানায়। আসলে প্রতিমারই যে পুতুল হ'তে সখ গেছে। প্রতিমা হয়ে থাকতে থাকতে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার জো হয়েছে।

অর্চনা যখন ভাব রূপ নিয়ে বিবাগিনী প্রবাসিনী হয়েছিল ততদিনে তার ছোট দুই বোন অর্চনা আর ঝর্ণার বিয়ে হয়ে গেছে। একজনের প্রেমজ বিবাহ আর একজনের বিবাহজ প্রেম। দু'জনেরই ছেলে-মেয়ে হয়েছে। দিদির সামনে যদিও তারা বলে, ঘর-গৃহস্থালীতে সুখ নেই, ভালো লাগে না ছাই এত ঝামেলা। এর চেয়ে তুমিই বেশ আছ দিদি।' কিন্তু তাদের মুখ দেখলে তা মনে হয় না। তাদের সান্ত্বনাকে নিতান্তই ছদ্ম সান্ত্বনা, ভুয়ো সান্ত্বনা, বলে মনে হয়। ওরা এক অদ্ভুত সুখের সন্ধান পেয়েছে। রস আর রহস্যে ভরা এক অপূর্ব পৃথিবীর খোঁজ পেয়েছে ওরা। আর সে পৃথিবী ক্রমেই

অর্চনার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ জন্মে সেই স্বপ্নের দেশকে বুঝি আর ধরা ছোঁয়া যাবে না। শুধু কি ঝর্ণা আর অপর্ণা? অর্চনার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন, পুরোন সহপাঠী সহপাঠিনীরা সকলেই সেই রসসিন্ধু পারঙ্গম। পারে বসে অর্চনারই কি শুধু ঢেউ গুণে দিন যাবে? দিন যদি বা যায় আঘাতে অস্থি-মজ্জা সব যেন চুরমার হয়ে যেতে চায়।

এর পর একদিন এক শীতের সন্ধ্যায় অর্চনা গৌতমকে বলল, 'আজ আমাদের বাসায় তোমাকে যেতেই হবে। বাবার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।'

আগেও কয়েকবার এমন প্রস্তাব করেছে অর্চনা। ওর বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগ্রহ জানিয়েছে। কিন্তু গৌতম তেমন উৎসাহ বোধ করেনি। অর্চনাকে বলেছে, 'বুড়ো মানুষদের আমি দূর থেকেই শ্রদ্ধা জানাই, কাছে গিয়ে সুবিধে করতে পারি নে। আমার মেয়ের মুখ দেখলে মুখ খোলে, মেয়ের বাবার মুখ দেখলে বন্ধ হয়।'

অর্চনা হেসে বলেছে, 'ভয় নেই, আমার বাবা তেমন বুড়ো নয়, মতামতের ব্যাপারে খুব আধুনিক। আমাদের তিন বোনকে ঠিক ছেলের মত মানুষ করেছেন। স্বাধীনভাবে চলতে-ফিরতে দিয়েছেন। কোন দিন কোন কিছুতে বাধা দেন নি।'

কিন্তু তবু গৌতম তেমন গা করেনি। যাব যাব করে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন অর্চনা একেবারে নাছোড়বান্দা, 'আজ যেতেই হবে তোমাকে, বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

মাণিকতলা অঞ্চলে পুরোন একখানা একতলা বাড়ি। কড়া নাড়তে আট-নয় বছরের একটি মেয়ে এসে দোর খুলে দিল। অর্চনা একখানা ঘরের সামনে গৌতমকে দাড় করিয়ে বলল, 'আসছি।' তারপর একটু বাদেই চাবি এনে ঘরের তালা খুলে দিল।

খুবই ছোট ঘর। উত্তর দিকে একটি মাত্র জানলা। সেই জানলা ঘেঁষে একখানা তক্তোপোষ পাতা। নীল রঙের চাদরে ঢাকা বিছানা। এক পাশে ছোট একখানা টেবিল আর চেয়ার। একটা -র‍্যাকে কিছু বই-পত্র।

গৌতম বলল, 'এই বুঝি তোমার ঘর?'

অর্চনা বলল, 'আপাতত এইখানাই আমার ভাগে প'ড়েছে। ওদিকে আরো দু'খানা আছে। এর চেয়ে একটু বড়। একখানায় ছেলে-মেয়ে নিয়ে কাকিমা থাকেন। আর একখানায় বাবা।'

গৌতম বলল, 'নিয়ে চল তোমার বাবার কাছে। অপ্রীতিকর কাজটা আগেই সেরে ফেলা যাক।'

অর্চনা হেসে বলল, 'ভয় নেই তোমার। অপ্রীতিকর কাজটাকে আরও পিছিয়ে দিয়েছি। কাঁচড়াপাড়ায় কাকিমা'র ভাইদের বাসা। সেখানে ওঁর মেজো ভাইয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন। সবাই সেখানে গেছেন নিমন্ত্রণ খেতে। কাল সকালে বাবা ফিরবেন। কাকিমা আরো দু'একদিন থাকবেন ভাইয়ের কাছে।'

গৌতম বলল, 'নিমন্ত্রণ খেতে তুমি গেলে না যে?

অর্চনা বলল, 'আমি নিমন্ত্রণ খাই নে। তা ছাড়া আমার যাওয়ার জো কই। অফিস আছে। অন্য কাজকর্ম আছে।'

গৌতম মুখ মুচকে হাসল, 'শুধু অফিস আর কাজকর্ম? আর কিছু নেই? আর কেউ নেই?'

অর্চনা হাসি চেপে বলল, 'আহা। আর আবার কে থাকবে?'

তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিন্তু একটু বাদেই ফের ঘরে এসে ঢুকে বলল, 'কাকিমা লক্ষ্মী মেয়ে। সব গুছিয়ে-টুছিয়ে রেখে গেছেন। তুমি একটু বোসো। আমি

ততক্ষণে রান্নাটা সারি। ভয় নেই, তার আগে চা এককাপ পাবে।'

চায়ের পর চিতল মাছের কোর্মা আর ভাত। একদিন কথায় কথায় গৌতম বলেছিল, 'আমার বউদি চিতল মাছের পেটি খুব ভালো রাঁধতেন। তেমন আর খেলাম না।'

কথাটা অর্চনা মনে রেখেছিল। মেয়েরা একজনের রান্নার প্রশংসা আর এক জনে সইতে পারে না। পাশের ঘরে যত্ন ক'রে খাওয়ার ঠাঁই করল অর্চনা। ভাত বেড়ে এনে বিনীত ভঙ্গিতে এসে বসল পাতের কাছে। তারপর লজ্জিত ভাবে বলল, 'দেখ তো খাওয়া যায় কি না। কত কাল এ সব রাঁধিনে। কাকিমা দেন না কিছু করতে। বলেন, দরকার নেই বাপু। সারাদিন চাকরি বাকরি খাটুনি—'

কিন্তু তাই বলে গৃহস্থালীর খাটনির সাধ না মেটালে কি চলে? গৌতম একা খেল না। ভাত বেড়ে নিয়ে অর্চনাকেও বসতে হোল ওর মুখোমুখি।

'কেমন হয়েছে?'

অর্চনা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল।

গৌতম বলল, 'খুব খারাপ।'

তারপর কড়াটা টেনে বাকি ঝোলটুকু সব নিজের পাতে ঢেলে নিল। অর্চনার পাতের মাছখানা কেড়ে ভেঙে নিল একটুকরো।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিরাম। কিন্তু গল্প অবিরামই চলল। ইচ্ছা করেই কেউ ঘড়ির দিকে তাকাল না। পাছে তার কাঁটা দুটো চোখে এসে বেঁধে।

তবু এক সময় উঠতে হোল। গৌতম বলল, 'যাই এবার।'

অর্চনা বলল, 'দাঁড়াও একটা কথা আছে। মানে একটা জিনিস আছে তোমার জন্যে।'

গৌতম বলল, 'ভোজনের পরে বুঝি দক্ষিণা। কই দেখি।'

স্যুটকেশ খুলে খবরের কাগজে মোড়া কি একটা জিনিস নিয়ে এল অর্চনা। গৌতমের হাতে দিল।

গৌতম বলল, 'কি এটা?'

অর্চনা বলল, 'কিছু না, বাড়ি গিয়ে দেখ।'

কাগজের মোড়কটা ছিঁড়ে ফেলল গৌতম। সুন্দর একটি সোয়েটার। মাস দুইয়েক আগে তার মেস থেকে ছেঁড়া পুরোনো সোয়েটারটা অর্চনা যে একদিন কুড়িয়ে এনেছিল, তা এতদিনে প্রায় ভুলতেই বসেছিল গৌতম।

'বেশ হয়েছে তো। পেটে পেটে এত বিদ্যে!' গৌতম হেসে বলল, 'আমার ধারণা ছিল কতকগুলি ফিলজফির নোট-বই ছাড়া তোমার পেটে আর কিছু নেই?'

অর্চনা বলল, 'হু, ওই রকমই তো তোমরা ভাব। কিন্তু ওটাকে ফের মোড়কে জড়াচ্ছ কেন। প'রে দেখ ঠিক হয়েছে না কি।'

গৌতম বলল, 'হুঁ। প'রে নেওয়াই ভালো।'

র‍্যাপার খুলল গৌতম। খুলে ফেলল তার নিজের জামাটা। তারপর গেঞ্জীর ওপর পরে নিল সোয়েটার। বলল, 'একটু ছোট ছোট হয়েছে মনে হচ্ছে।'

অর্চনা হেসে বলল, 'ছোট হবে কেন, সোয়েটার এই রকম একটু টাইট্‌ই হয়। কই দেখি?'

গৌতমের কাছে আরো এগিয়ে এসে সোয়েটারটা নিচের দিকে একটু টেনে দিল অর্চনা, তারপর সরে যেতে গিয়ে দেখে আটকা পড়ে গেছে।

গা কাঁপল, গলা কাঁপল অর্চনার, আস্তে আস্তে বলল, 'ছাড়ো।' কিন্তু ছাড়িয়ে নেওয়ার আর কোন চেষ্টা করল না, অবশ্য করলেও যে যেতে পারত তা নয়।

ঘণ্টা খানেক বাদে বিদায় দেওয়ার সময় অর্চনা বলল, 'আর আমার কোন ভয় রইল না, দায় রইল না। এখন থেকে সব তোমার।'

এর জবাবে গৌতম ওর নরম হাতখানা নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে সস্নেহে আর একবার চাপ দিল।

তারপর থেকে পাবলিসিটি অফিসে আর এলনা অর্চনা।

গৌতম বলল, 'ব্যাপার কি, বিজ্ঞাপনের কাজ শেখার সখ মিটে গেল না কি, তোমার?'

ক্যাম্পবেল হাসপাতালের মাঠের একটা নিরালা কোণে ঘাসের ওপর বসে দু'জনে কথা বলছিল। অর্চনা নিজের মনে কয়েক গাছা দুর্বা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, 'হ্যাঁ, একটা মাষ্টারী পেয়ে গেছি। তোমাদের আফিসে আর যেতে ভালো লাগে না। তোমার কলীগরা কি রকম ক'রে তাকায়। ভারি বিশ্রী লাগে। তা ছাড়া—'

গৌতম বলল, 'তা ছাড়া?'

অর্চনা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তা ছাড়া ওর সামনে বসে কাজ করতে আমার কেমন লজ্জা করে। আচ্ছা, ও কি সব বুঝতে পেরেছে? তোমার কি মনে হয়?'

গৌতম বলল, 'বুঝতে পারাই তো স্বাভাবিক! ও তো আর বোকা নয়?'

অর্চনা বলল, 'না, বোকা হবে কেন? তবে মনের দিক থেকে ভারি ছেলে মানুষ। কিন্তু খুবই ভালো ছেলে।'

গৌতম বলল, 'ভালো ছেলেকে তোমার এত লজ্জা কিসের। এত লজ্জা তো ভালো নয়?'

অর্চনা বলল, 'ব্যস্ত হচ্ছ কেন? একদিন কোন লজ্জাই আর থাকবে না। চল, বাবার সঙ্গে গিয়ে সত্যিই একদিন আলাপ করে আসবে। এবার আলাপ করা দরকার।'

'হুঁ।' ঘাসের ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল গৌতম।

অর্চনা এগিয়ে এল কাছে, 'ওকি, শরীর খারাপ লাগছে না কি?'

গৌতম বলল, 'না।'

'তবে শুয়ে পড়লে যে?'

অর্চনা একটু ইতস্তত করে গৌতমের মাথাটা নিজের কোলের ওপর রাখল।

গৌতম বলল, 'ঠিক এই জন্যেই শুয়েছিলাম।'

অর্চনা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহা।'

তারপর গৌতমের শাম্পু-করা ঘন চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'তোমার চুলগুলি সত্যিই ভারি সুন্দর!'

গৌতম বলল, 'এই, অত জোরে টেন না। সব শুদ্ধ উঠে আসবে।'

অর্চনা বিস্মিত হয়ে বলল, 'তার মানে?'

গৌতম বলল, 'আসলে ওগুলি চুল নয়, পরচুলা।'

অর্চনা বলল, 'যাঃ।'

গৌতম বলল, 'এক বন্ধু আমার চুল সম্বন্ধে তোমারই মতই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠায় তাকেও ঠিক এই কথাই বলেছিলাম. ঠাট্টা বুঝতে পেরে একটু বাদে সে বলেছিল. তোমার চুলগুলো পরচুলো কি না জানি নে, কিন্তু মুখটা মুখোস. আমি বলেছিলাম, চোখটা পাথরের, চামড়া গণ্ডারের—গোটা বেশটাই ছদ্মবেশ। কিন্তু এমন করে আটকে গেছে যে খোলার উপায় নেই, বোঝার উপায় নেই। শুধু যে অন্যের চোখকেই ভোলাই তা নয়, নিজের চোখকেও ধাপ্পা দেই।'

অর্চনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'থাম গৌতম। সব সময় তোমার ওই কথার কায়দা আমার ভালো লাগে না। মনে হয় যেন এক বিদেশী ভাষায় কথা বলছ।'

গৌতম বলল, 'ঠিক বলেছ। বিদেশী ভাষাই বটে কিন্তু মাতৃভাষা যে বেমালুম ভুলে গেছি অর্চনা! এখন এই ভাষাই আমার একমাত্র ভাষা।'

অর্চনা বলল, 'মাতৃভাষা কি কেউ ভোলে? বেশ, যদি ভুলে গিয়েই থাক, আমি তোমাকে ফের শেখাব, আমি তোমাকে নতুন ক'রে মনে করিয়ে দেব। তুমি সহজ হও গৌতম, সহজ ভাবে কথা বল, সহজ ভাবে চল। আমি তো সব দিয়েছি। তুমিও সব দাও।'

গৌতম বুঝতে পারল অর্চনার গলা আবেগে ভিজে। ওকে একটু সময় দিয়ে গৌতম বলল, 'আমাকে অনেকে অনেক রকম আশ্বাস দিয়েছে অর্চনা, কিন্তু মাতৃভাষা শেখাবার আশ্বাস এই প্রথম, বেশ, তোমার কাছেই ভাষা শিখব। কিন্তু তাকে মাতৃভাষা বলব না, বলব প্রিয়ার ভাষা।

অর্চনা ফের খানিকটা চুপ ক'রে রইল তারপর বলল, 'ওই একই কথা গৌতম! একটা নতুন নাম যদি দিতেই চাও, তাকে প্রিয়ার ভাষা বলো না, বলো প্রীতির ভাষা, বলো প্রেমের ভাষা। সে ভাষা মাতৃভাষার মতই সকলের কাছে সহজ। শুধু দু-একজন আছে জন্ম-বোবা। না হয় প'রে কোন দুর্ঘটনায় দোষ হয়েছে জিভের। তাই সেই সহজ ভাষাও তাই তারা শিখতে পারে না। সারা জীবন অদ্ভুত বিকট শব্দ করে আর ইসারা-ইঙ্গিতে কাজ চালায়। আর যাই করো, তাকে নতুন একটা সভ্য ভাষা বলে চালাতে চেষ্টা করো না গৌতম, দোহাই তোমার।'

গৌতম একটু চমকে উঠল। অর্চনা কোনদিন ঠিক এই ভাষায় কথা বলেনি। পারত পক্ষে কোন তত্ত্বের আলোচনায় যোগ দেয়নি। আজ ওর হোল কি!

খানিক বাদে গৌতম উঠে বসে বলল, 'চল, যাওয়া যাক এবার। রাত হয়েছে।'

বিজ্ঞাপন রচনার কাজ শিখতে অর্চনা যে আসা বন্ধ করেছে তা শ্যামলের লক্ষ্য না করার কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য, শ্যামলের যেন কৌতুহল বলে কোন বস্তু নেই। অফিসের অনেকেই গৌতমকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে। একেক জনকে একেক রকম জবাব দেয় গৌতম। কিন্তু শ্যামল যদি জিজ্ঞেস করত ওকে ঠিক সত্য কথাই বলত। শ্যামল অর্চনা সম্বন্ধে কোন কথাই গৌতমকে জিজ্ঞেস করল না। যেন কিছু জানবার প্রয়োজন তার নেই। এর আগে গৌতমের সঙ্গে শ্যামল কত রকম রসিকতা করত, হাসত, গল্প করত, সিনেমা দেখত। এখন সে সব প্রায় বন্ধ হওয়ার মধ্যে। যা হয়, কাজের কথাবার্তাই হয়, যত পারে গৌতমকে এড়িয়ে চলে শ্যামল। মাঝে মাঝে গোতম সত্যিই ভারি দুঃখ পায় ওর জন্যে কেবল ওর জন্যে না, নিজের জন্যও। কারণ ইদানীং শ্যামলেব মত ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার ছিল না। সেই বন্ধুত্ব এমন করে নষ্ট হোক তা গৌতমের মোটেই ইচ্ছা নয। কারণ, সত্যিকারের বন্ধু প্রিয়ার চেয়েও দুর্লভ। বন্ধুত্বের যে ক্ষুধা তা আর কেউ মেটাতে পারে না। দারা নয়, পুত্র নয়, বাপ নয়, ভাই নয়, এমন কি প্রিয়াও নয়। বন্ধুত্বের যে স্বাদ সে সম্পূর্ণ আলাদা। আর মানুষ চায় সব রকমের স্বাদ এক জিভ দিয়ে চেখে দেখতে। মাকেও চাই মাসীমাকেও চাই। নিজের বোনকেও দরকার, আবার স্ত্রীর বোনকেও না হলে চলে না। আর বন্ধু! এই বন্ধুরই কি রকম-ভেদ কম? অপারেশন টেবিলের বন্ধু আর চায়ের টেবিলের বন্ধু, শীতকালের বন্ধু আর বসন্ত কালের বন্ধু কাউকেই ফেলবার জো নেই কল্যাণদা! যার যার টেবিলে সেই সেই বড়। জীবনের পাত্রে সবাই রসের যোগানদার। সে রস একরকমের নয়। আমাদের কত ভাগ্য যে, এক রকমের নয়! শুধু নবরস নয়, নব নব রস।

তাই অর্চনার সান্নিধ্য সত্ত্বেও শ্যামলের জন্যে মন কেমন করে উঠল

গৌতমের। না, এ তার উদারতা নয়, পরদুঃখে কাতরতা নয়, শুধু আর এক ধরণের সম্পর্কের স্বাদ নেওয়ার আসক্তি।

সেদিন ছুটির পরে শ্যামল তাকে না বলেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল গৌতম গেল ওর পিছনে পিছনে, বলল, 'লুকিয়ে লুকিয়ে কি বই নিয়ে যাচ্ছ দেখি ?'

শ্যামল বলল, 'দেখে সুখ পাবে না। হায়ার ম্যাথেম্যাটিকস্। আর একবার চেষ্টা করে দেখি, এম-এটা দেওয়া যায় কি না।'

রাস্তায় নেমে গৌতম তবু বইটা বন্ধুর হাত থেকে কেড়ে নিল। তারপর একটু নেড়েচেড়ে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'আগেকার আমলে এসব অবস্থায় লোকে বৈরাগ্যশতক পড়ত। এখনকার ফ্যাসান বুঝি গণিত শতক। কি বল ? জবাব দিচ্ছ না যে ?'

শ্যামল বলল, 'এ সব বাজে কথার আমি জবাব দেই নে।'

একটা চায়ের দোকান সামনে পড়ল। গৌতম হাত ধ'রে তাকে টেনে নিয়ে গেল সেখানে।

শ্যামল আপত্তি করল, 'আমার কাজ আছে গৌতম। একজন প্রফেসরের কাছে যেতে হবে।'

গৌতম বলল, 'বেশ তো, তুমি অঙ্কের বদলে ফিলসফি পড়, আমি প্রফেসর জুটিয়ে দিচ্ছি।'

চায়ের টেবিলে অনেকদিন বাদে দু'জনে বসল মুখোমুখি। কাপে একটু-চুমুক দিয়ে গৌতম বলল, বাজে কথাই যদি হবে, তুমি অমন মুখ ভার ক'রে রয়েছ কেন শ্যামল ? কেন আগের মত হাসছ না, কথা বলছ না, মিশতে পারছ না আমাদের সঙ্গে ? তোমার হয়েছে কি সত্যি ক'রে বল তো ?'

শ্যামল চায়ের কাপটা তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে বলল, 'কিছুই হয়নি।

আমার প্রফেসরের বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে।'

কিন্তু দু'দিন বাদে শ্যামল এসে অন্য কথা বলল, 'গৌতম, এক হিসেবে তোমার কথা সত্যি।'

গৌতম বলল, 'আমায় কোন কথার কথা বলছ বল তো? দিন ভ'রে আমি এত উল্টো-পাল্টা কথা বলি যে, আমার এক কথাকে সত্যি বলতে গেলে আর এক কথাকে মিথ্যা বলতে হয়।'

শ্যামল বলল, 'তুমি যে আমাকে মুখ ভার ক'রে থাকার অপবাদ দিয়েছ সেই কথা বলছি। সত্যি আমার অমন করবার কোন মানেই হয় না। তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবার মোটেই ইচ্ছে আমার নেই। জানো তো, আমি তেমন মিশুক নই, বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও আমার খুব কম। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমরাই আমাকে এড়িয়ে চলছ, আবার তোমরাই অপবাদ দিচ্ছ, মুখ ভার ক'রে আছি, কথা বলছিনে।'

গৌতম বলল, 'আমি এড়িয়ে চলছি তোমাকে?'

শ্যামল বলল, 'মানে তোমরা।'

গৌতম হেসে বলল, 'ও, গৌরবে বহুবচনা এখানে অবশ্য দ্বিবচন। সত্যি অর্চনার অমন সঙ্কোচের কোন মানে হয় না, ওকে একটু ভালো ক'রে বুঝিয়ে দাও না, তোমার-আমার সম্পর্ক আর যাই হোক, ওসমান-জগৎ সিংহের নয়। সেই রকম একটু ধাঁচ যদি আসেও আমরা নিশ্চয়ই অসি যুদ্ধে নামব না। একে তো অস্ত্র আইনে আমাদের তরোয়াল নেই। যদি বা কোন থিয়েটার পার্টির কাছ থেকে দু'খানা তরোয়াল ধার করে আনি তা ঘুরাবার মত জায়গা পাব না। এক টেবিলে মুখোমুখি বসে কেরাণীগিরি করতে করতে ওসমান-জগৎ সিংহ সাজলেও অসি যুদ্ধ করা সাজে না। মসীযুদ্ধে আপত্তি নেই। তবে ভাই, কলমের খোঁচাই মেরো, কিন্তু কালি ছিটিয়ো না। জামা-কাপড়ের দর চড়া, লণ্ড্রি-চার্জও কম নয়।'

শ্যামল একটু যেন দুঃখিত হোল, বলল, 'জীবনভর তুমি কি কেবল ভাঁড়ামি করেই যাবে গৌতম?'

গৌতম বলল, 'আমার তো তাই ইচ্ছে। কিন্তু তোমরা তা হতে দিচ্ছ কই।'

শ্যামল বলল, 'দেওয়া যায় না গৌতম। জীবনকে শুধু ভাঁড়ামি ক'রে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—জীবন অনেক ভারী, অনেক দামী। আমি তোমাকে একটা কাজের কথা বলতে যাচ্ছিলাম।'

'বল।'

'ওঁকে নিয়ে আমাদের কোন misunderstanding হোক, কোন জটিলতার সৃষ্টি হোক তা আমি চাই নে। ওঁকে যদি তুমি ভালোবাস উনি যদি তোমাকে ভালোবাসেন, বেশ তো, আমি তাতে আপত্তি করতে যাব কেন? তোমরা মিছামিছি আমাকে এমন আড়ালে রেখেছ বলেই এই ভুল বোঝাবুঝির সুরু হয়েছে।'

গৌতম বলল, 'দেখ বিশেষ ক'রে তোমাকেই যে আমরা আড়ালে রেখেছি তা নয়। ব্যাপারটা এমনি যে সমস্ত জগৎটাই কিছু দিনের জন্য আড়ালে পড়ে যায়, আর কিছুই চোখে পড়ে না। বেশ তো, নেপথ্যলোক থেকে তুমি যদি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে চাও, যে কোন একটা উইংসের ভিতর দিয়ে চলে এসো—আমার কিছু মাত্র অসুবিধে নেই। ষ্টেজ খুব চওড়া।'

শ্যামল বলল, 'তাহলে কাল বিকেলে এসো আমাদের ওখানে।'

'কেন কোন ফাংশন-টাংশন আছে না কি?'

শ্যামল বলল, 'না, ফাংশন আবার কিসের, তোমরা গেলেই ফাংশন হবে। একসঙ্গে একটু চা-টা খাব, গল্প-গুজব করব। জ্যোতি এসেছে ক'দিন ধ'রে! তার সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ হবে।'

জ্যোতি শ্যামলের বোন, বছর খানেক আগে বিয়ে হয়েছে। ঘটকালি করেছিল গৌতম। ছেলেটি ভালো। বেশ চাকরি-বাকরি করে। সম্বন্ধটা খুব সুখেরই হয়েছে, সে জন্যে শ্যামলের বাড়ির সবাই গৌতমের ওপর খানিকটা কৃতজ্ঞ।

শ্যামল বলল, 'ওঁকে আমি আলাদা ক'রে নিমন্ত্রণ করব, তোমাকে ভাবতে হবে না। আমাদের বাসায় আগে তো ওঁদের খুবই যাতায়াত ছিল। ইদানীংই একটু কমেছে।'

অফিস থেকে মেসে ফিরে এসে মা'র একখানা চিঠি পেল গৌতম। ব্যাকরণ-ভুলে ভরা খামে মোড়া পুরো চার পৃষ্ঠার চিঠি। কিন্তু ঘুরে-ফিরে কথা সেই একই। টাকা পাঠাও। ভাই-বোনগুলির জামা নেই, কাপড় নেই। খোরাক নেই ঘরে। সংসার চলে না। মা'র মত এমন নেতিবাদিনী দ্বিতীয় কোন মহিলা যদি পৃথিবীতে থাকে। বাবা শান্তিপুরেই সামান্য চাকরি করেন। সুযোগ বুঝে সংসার থেকে তিনি প্রায় সরে দাঁড়িয়েছেন। কোন ভালো-মন্দয় থাকেন না। কথায় কথায় বলেন, 'তোর ভাই-বোনদের তুই দেখবি না তো দেখবে কে?' তোর ভাই-বোন। নিজের ছেলে-মেয়ে সে কথা বলেন না। ছেলেবেলায় গৌতমদের বাড়িতে একটি ভিখিরি আসত। অল্প ভিক্ষায় তার মন উঠত না, বলত, 'কর্তা, এ ক'টা চাল আমার কি হবে। ঘরে বউ, পাঁচ-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে।' গৌতমের বাবাই বলতেন, 'নিজে খেতে পাস নে, অতগুলি ছেলে-মেয়ে কেন হোল?' ভিখিরী জবাব দিত, 'কি যে, বলেন কর্তা। ওগুলি কি আমার নাকি। বাবা জোর ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন। মরবার সময় কতকগুলি নাতি-নাতিনী গছিয়ে দিয়ে জব্দ করে গেছেন।' গৌতমের বাবা হেসে উঠে আর এক মুঠো বেশি চাল দিতে বলতেন ওর থলিতে। এখন বাবার কথা শুনে

সেই ভিখিরির কথা মনে পড়ে গৌতমের। বাবার মতই হাসে। কিন্তু এক মুঠো বেশি চাল দিতে পারে কই!

অফিসের সামান্য মাইনে। তাও নিয়মিত আদায় হয় না। এ মাসে যা পেয়েছে মেসের ম্যানেজার কেড়ে নিয়েছেন। কি ক'রে এখন টাকা পাঠায় গৌতম। কিন্তু মা যে ভাবে লিখেছেন তাতে তো না পাঠালেও চলে না। একটা অসহায় আক্রোশে সারারাত ছটফট করতে লাগল গৌতম। রাগ হোল নিজের ওপর, মার ওপর, বাবার ওপর, ছোট ভাই-বোনগুলির ওপর, আফিসের মনিবের ওপর এমন কি অর্চনার ওপরও মনটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। অবশ্য অর্চনার এতে কোন দোষ ছিল না। কিন্তু টাকার চেষ্টা না ক'রে ওর সঙ্গে সময় নষ্ট ক'রেছে বলে অর্চনার ওপরও খানিকটা আক্রোশ জন্মে গেল। এ যেন বেশি দামের টিকেটে সিনেমা দেখে পকেট খালি ক'রে এসে সিনেমা হাউসটার ওপর রাগ।

ভোরে উঠে বেরুল টাকা ধারের চেষ্টায়, কিছুই কারো কাছে মিলিল না। বরং দু'জন পুরোন মহাজনের অবাঞ্ছিত দেখা মিলল। দু'জনেই তাগিদ দিলেন। এক জন সরাসরি। একজন একটু ঘুরিয়ে।

বিকেলের দিকে শ্যামলদের বাসায় চায়ের নিমন্ত্রণে যাওয়ায় আর তেমন ইচ্ছে রইল না গৌতমের। কিন্তু শ্যামল অত ক'রে ব'লে গেছে, পাছে ও কিছু মনে করে, তাই গিয়ে হাজির হোল। খানিকক্ষণ কোন রকমে ভুলে থাকা যাবে এ আশাও যে ছিল না তা নয়!

বিডন ষ্ট্রীট অঞ্চলে নয়ন চাঁদ দত্ত লেনে শ্যামলদের বাসা। দোতলায় দু'খানা ঘর। টাকা ষাটেক ভাড়া, শ্যামল মাঝে মাঝে বলে, 'এত ভাড়া আর গুণতে পারি নে ভাই। কিন্তু উপায় কি, মাথা তো একজায়গায় গুঁজতেই হবে।'

তবু এরই মধ্যে শ্যামলের ঘরখানা বেশ ভালো, খুব খোলা-মেলা। গৌতম গিয়ে দেখল সেই ঘর আজ আরো খুলেছে। মেঝেয় রঙীন মাদুর পেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে জ্যোতির সঙ্গে গল্প করছে অর্চনা। সাজ-সজ্জায় আজ ওর বেশ একটু পারিপাট্য আছে। কম বয়সী মেয়েদের মত চড়া-রঙের শাড়ি ওর পরনে। আঁচলের রঙ নীল। পাড়টা চোখে পড়বার মত চওড়া। বয়স যেন বছর দশেক কমে গেছে অর্চনার। ও যেন জোর ক'রে কমিয়ে দিয়েছে।

কাছেই একটা জল চৌকিতে বসে শ্যামলও গল্প করছে বোন আর বান্ধবীর সঙ্গে। গৌতমকে দেখে বলল, 'এত দেরী হোল যে তোমার? আমরা কতকক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা করছি।'

মাদুরে না বসে চেয়ারটাই টেনে নিল গৌতম, বলল, 'তাই না কি!'

জ্যোতি বলল, 'এলেন দেরি ক'রে, তারপর এইরকম একটা ঝোড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে। এদিক থেকে অর্চনাদি বরং অনেক লক্ষ্মী মেয়ে।'

গৌতমের বেশ-বাসে পারিপাট্য তো ছিলই না। বরং দারিদ্র্যের ছাপ একটু যেন প্রকট হয়েই উঠেছিল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে গৌতম বলল, 'ভালোই তো। লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে একটি পেঁচারও তো দরকার।'

জ্যোতি বলল, 'আহা, এখানে কে যে পেঁচা আর কে যে নারায়ণ তা সবাই জানে। বলে জ্যোতি মুখ নিচু করে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল।'

শ্যামল ধমক দিয়ে বলল, 'এই, কি হচ্ছে জ্যোতি! যা, চা-টা নিয়ে আয় এবার।'

জ্যোতি সঙ্গে সঙ্গে উঠে চায়ের আয়োজনে বেরিয়ে গেল।

খাবারের প্লেট আর চায়ের কাপ সামনে নিয়ে আলাপ-আলোচনা

জমিয়ে তুলল, কয়েকজনে। কিন্তু আলাপটা শ্যামল আর অর্চনার মধ্যেই বেশির ভাগ চলল। গৌতম ঠিক আগের মত যোগ দিতে পারল না। আজ ওর কথার উৎসে কিসের একটা পাথর চাপা পড়েছে। মা'র জন্যে এখনো কোন ব্যবস্থা করতে পারে নি সে কথা ভুলেও ভুলতে পারছে না।

শ্যামল বলল, 'তোমার আজ কি হয়েছে গৌতম? তুমি মুখ না খুললে কি আসর জমে?'

গৌতম বলল, 'আজ তোমরাই না হয় জমাও একটু। আমি দেখি।'

শ্যামল বলল, 'বেশ, তুমি কথা না বললেই যে আসর জমবে না তা ভেব না। তোমার কথার বদলে আজ আমরা ওঁর গান শুনব। তারপর অর্চনাব দিকে ফিরে তাকাল শ্যামল, 'গৌতম বোধহয় আমাদের আসর পণ্ড করতে চাইছে। আপনিও কি ওর সঙ্গে যোগ দেবেন?'

ভারি স্নিগ্ধ, আর অনুনয়-মধুর শ্যামলের গলা।

অর্চনা শ্যামলের দিকে চোখ তুলে তাকাল, তারপর একটু মিষ্টি হেসে বলল, 'না, তা কেন দেব? তবে আমি গান সুরু করলে তোমাদের আসর একদিক থেকে পণ্ডই তো হবে।'

শ্যামল বলল, 'মোটেই তা হবে না। আর যাই করুন, গান নিয়ে আপনি বিনয় করবেন না। তার চেয়ে দু'-একখানা রবীন্দ্র-সঙ্গীত বরং গান, বেশ লাগবে। অনেক দিন আপনার গান শোনার সুযোগ হয় না।'

প্রসন্ন পরিতৃপ্তির ছাপ লাগল অর্চনার মুখে। শ্যামলের কাছ থেকে এই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির যেন ওর খুব প্রয়োজন ছিল। এতদিন কিসের একটা লজ্জা, এক ধরনের অপরাধ বোধ ছিল অর্চনার মনে। আজ শ্যামলের এই সৌহৃদ্যে তা দূর হোল। শ্যামলের এই স্বীকৃতি তো শুধু অর্চনাকেই নয়, অর্চনা আর গৌতমকে। তাদের সম্বন্ধকে।

অর্চনা বলল, 'আমার গান কি তোমার এখনো ভালো লাগবে?'

সত্যি বলছ ?'

শ্যামল কোন কথা না বলে শুধু মাথা নাড়ল।

জ্যোতি পাশের ঘরের ভাড়াটেদের ওখানে হারমোনিয়ম খুঁজতে গিয়েছিল। হারমনিয়ম পাওয়া গেল না।

অর্চনা বলল, হারমোনিয়মের দরকার হবে না। আমি অমনিই গাইছি।'

তারপর পর-পর দু-দু'খানা রবীন্দ্রনাথের গান গাইল অর্চনা। রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ভালই গায়। কিন্তু সেদিন যেন গানের মধ্যে ও সমস্ত অন্তর ঢেলে দিয়েছিল। সুর দিয়ে কথা দিয়ে অর্চনা যেন প্রাণ-পনে ঝোড়ো কাকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করল। আজ কোন অশোভনতাকে ও মানবে না, কোন কুশ্রীতাকে ও আমল দেবে না।

জ্যোতি আর একখানা গানের জন্য অর্চনাকে অনুরোধ করতে যাচ্ছিল, গৌতম হটাৎ চেযার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, আমি এবার চলি শ্যামল! একটু কাজ আছে আমার।'

শ্যামল একবার অর্চনার দিকে তাকাল, তারপর গৌতমের দিকে চেয়ে বলল, 'চল, আমিও এবার বেরুব।'

শ্যামলের মা গান শুনবার জন্য দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। গৌতমকে যেতে দেখে বললেন, 'চললে নাকি গৌতম? এসো আর একদিন! তুমি তো যাওয়া-আসা আজ কাল ছেড়েই দিয়েছ।'

গৌতম বলল, 'সময় পেয়ে উঠিনে মাসীমা! আচ্ছা আসব আর একদিন।'

রাস্তায় মোড়ে সিগারেট কিনতে গৌতমের বেশ একটু সময় লাগল। অর্চনা এসে পৌছল ততক্ষনে! না শ্যামল সঙ্গে আসেনি। একাই এসেছে অর্চনা।

পাশাপাশি চুপ-চাপ খানিকক্ষন হাঁটবার পর অর্চনা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আজ কি হয়েছে বল তো ?' অর্চনার গলায় তিরস্কারের ঝাঁজটা স্পষ্ট।

গৌতম বলল, 'কি আবার হবে।'

অর্চনা বলল, 'দেখ, ঢাকতে চেষ্টা কোরোনা। কি হয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি। আসলে তোমার ইচ্ছে ছিলনা আমি শ্যামলদের বাড়িতে আসি। ওর অনুরোধে গান গাই। ছিঃ তোমার মন যে এত ছোট তা আমি ভাবতেও পারিনি। তুমি জানো আমি ওকে কি চোখে দেখি ? শুধু শ্রদ্ধা আর স্নেহ তা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তুমি কুৎসিত ঈর্ষা দিয়ে হিংসা দিয়ে এই সহজ সুন্দর সম্পর্ককেও নষ্ট ক'রে দিচ্ছ। ওর মন অনেক সরল অনেক পবিত্র।'

গৌতমের আর সহ্য হোল না। ব্যঙ্গ-বিকৃত স্বরে বলল, 'অর্চনা, শ্যামলের বাবা এখনো মাসে মাসে সরকারী পেনসন পান। অফিসের মাইনে না পেলে আমার মত শ্যামলকে ধারের জন্য সহরময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয় না। তাই ওর পক্ষে সরলতার চর্চা করার সময় আর সুযোগ যতখানি জোটে আমার তা জোটে না। তার জন্যে আফশোষ করে লাভ কি ?'

অর্চনা বলল, 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা করেও কিছু লাভ নেই গৌতম ! মানুষের বাইরের দারিদ্র্যকে সওয়া যায়, কিন্তু ভিতরের দৈন্যকে সহ্য করা বড় কঠিন। সহ্য করা উচিত নয়।'

অর্চনার কালো বড় বড় সুন্দর দু'টি চোখ আবিল হয়ে উঠল। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল গৌতম। তারপর হেসে বলল, 'দেখ অর্চনা, আসলে মানুষের ভিতর-বাহির বলে আলাদা কিছু নেই, ও কেবল কথার কথা। জামাটা যখন গায়ে থাকে তখন

চামড়াটাই ভিতরের বস্তু। মন বল, প্রাণ বল—'

অর্চনা বলল, 'থাক থাক তোমার অশিক্ষিত পটুত্ব ফিলসফির ওপর না ফলালেও চলবে।' গৌতম স্থির দৃষ্টিতে অর্চনার দিকে তাকাল, তারপর বিদ্রূপের ভঙ্গিতে অদ্ভুত হেসে বলল, 'ও! ফিলসফিতে তোমার যে একচেটে অধিকার তা ভুলে গিয়েছিলাম। আমাকে মাফ কর অর্চনা!'

অর্চনাও লজ্জিত হয়েছিল। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'কিছু মনে কোরো না। আমি সে কথা ভেবে বলিনি, ভুল বুঝোনা আমাকে।'

গৌতম বলল, 'আমি ভুল বুঝিনি।'

হেদুয়ার কাছে এসে অর্চনা বলল, 'চল, পার্কে গিয়ে বসি একটু।'

গৌতম বলল, 'না অর্চনা, আজ সময় হবে না, অন্য দরকার আছে।'

অর্চনা বলল, 'কি দরকার একটু শুনতে পারিনে?'

গৌতম বলল, 'একটু কেন, খুবই পারো। টাকার দরকার। ধারের চেষ্টায় বেরুতে হবে।'

অর্চনা বলল, 'শোন, আমার কাছে সামান্য কিছু আছে। তাই তাই দিয়ে এখনকার মত—'

গৌতম বলল, 'না। তোমার কাছ থেকে অনেক অসামান্য জিনিসই তো নিয়েছি। সামান্য কিছু নিয়ে আর দরকার নেই।' বলে শ্যামবাজার-গামী একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়ল গৌতম। একা একা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল অর্চনা।

পরদিন ছুটির পর অফিস থেকে বেরিয়ে এসে গৌতম দেখল, অর্চনা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। গৌতম বলল, 'কি ব্যাপার?'

অর্চনা বলল, 'এমনিই এলাম। চল, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

গৌতম একটু হাসল, 'মাত্র একটা কথা? আচ্ছা চল।'

একটা দোকান থেকে চা খেয়ে নিয়ে দু-জনে চলল গড়ের মাঠের

দিকে। অনেকটা পথ নিঃশব্দে হেঁটে একটু নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসল। এমন অনেক দিনই বসেছে।

একটু চুপ করে থাকার পর অর্চনা বলল, 'কালকের দরকারের কি করলে?'

গৌতম বলল, 'সে মিটে গেছে। সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।'

অর্চনা আরও একটু কাল চুপ ক'রে রইল, তার পর বলল, 'কিন্তু আমি যে ভাবতে চাই গৌতম। আমি চাই তুমি আমার সব জিনিসের জন্যে ভাব, আমি তোমার সব জিনিসের জন্যে ভাবি। আমি জানি কিসে তোমার বাধছে। কিন্তু আর তো কোন বাধার কারণ দেখি নে। শুধু বাইরের একটা অনুষ্ঠানের বাধা। সেটা কোন দিন সেরে ফেললেই হয়।'

গৌতম বলল, 'তা হয় না অর্চনা।'

অর্চনা একটু হাসল, 'কি হয় না? ও, তোমার বুঝি এক দিনের অনুষ্ঠানে মন ভরবে না? একেবারে গায়ে-হলুদ থেকে সুরু করতে হবে?'

গৌতম বলল, 'না, তাও নয় অর্চনা। আমি ওসব কোন কিছুর মধ্যেই যেতে চাই নে।'

অর্চনার মুখের হাসি নিবে গেল, 'এ কি বলছ তুমি?'

গৌতম বলল, 'ঠিকই বলছি আমার ধারণা ছিল, এ কথা এত স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে না। তুমি এমনিতেই বুঝে নেবে। কিন্তু তুমি যখন খোলা-খুলি ভাবেই জিজ্ঞেস করলে, আমিও তেমনি ভাবেই জবাব দিচ্ছি। তুমি যা ভেবেছ তা সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয়?'

অর্চনার ভিতর থেকে যেন এক অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

গৌতম বলল, 'না।'

'কেন?'

গৌতম বলল, 'তার কারণ অনেক। প্রথমতঃ বিয়ে জিনিসটার ওপর আমার কোন বিশ্বাস নেই। বরং একটা আন্তরিক বীতস্পৃহা আছে।'

অর্চনা বলল, 'এ তোমার অসুস্থ মনের আর একটা লক্ষণ।'

'হতে পারে।'

অর্চনা বলল, 'দ্বিতীয় কারণটা কি?'

গৌতম বলল, 'দ্বিতীয় কারণ তোমার সঙ্গে আমার এমন মিল নেই যাতে আমরা অত কাছাকাছি, অত ঘনিষ্ঠভাবে বাস করতে পারি। তোমার চোখে আমি হৃদয়ের দিক থেকে ছোট, বুদ্ধিতে বিকৃত, বিদ্যায় নিরক্ষর। আমাদের কি করে মিল হবে?'

অর্চনা এবার একটু হাসল, 'ও, কালকের সেই কথাটা বুঝি তুমি আজও ভুলতে পারো নি পুরুষের আত্মভিমান একেই বলে। শোন, সে জন্যে কালই আমি ক্ষমা চেয়েছিলাম, আজও চাইছি। বিদ্যে নিয়ে অহংকার করতে আমার লজ্জা করে। কোনদিন আমি তা করি নে। অহংকারের আছেই বা কি, একটা ডিগ্রীই শুধু বেশি, তা ছাড়া আর কিছু নেই।'

গৌতম বলল, 'চুপ করো অর্চনা। তোমার এই বিনয় অহংকারেরই আর একটা ভঙ্গি। অহংকারটা দোষের নয়, অস্বাভাবিকও নয়, কিন্তু অস্বাভাবিক তুমি যা বলতে চাইছ তাই, অস্বাভাবিক এই বিয়ের প্রস্তাব।'

'অস্বাভাবিক।'

গৌতম বলল, 'হ্যাঁ, বিয়ে ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষকে দেখে দেখে, তাদের ঘরকন্না, ভালোবাসার ভণ্ডামি দেখে দেখে এ ধারণা আমার মজ্জাগত হয়ে গেছে, প্রথম দেখলাম আমার বাবাকে আর মাকে। ঘৃণা করতে করতে কি ভাবে যে দু'জনে ঘর করা যায় তার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। সে দৃষ্টান্ত আর বাড়াব না।

তার চেয়ে এই ভালো। এই খোলা মাঠ, আর ছাড়া পথ। এই আকাশ-ভরা তারা। চার দেয়ালের মধ্যে আমরা যদি মাথা গুঁজি, ঘৃণা আর বিদ্বেষের বাষ্পে দু'দিনের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসবে। কিন্তু খোলা হাওয়ায় বাষ্প জমবার অবসর পাবে না। এই ভালো অর্চনা, আমরা যেমন আছি, তেমনি থাকি। তা'হলেই সব চেয়ে ভালো থাকব।'

অর্চনা ওর কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'চুপ কর। কাব্য দিয়ে অন্যায়কে ঢাকতে চেষ্টা করো না, দায়িত্বকে এড়াতে চেষ্টা করো না।'

অর্চনার গলার স্বরে সেই পুঞ্জীভূত ঘৃণা।

কিন্তু গৌতম আজ আহত হোল না, হেসে বলল, 'দায়িত্ব। দায়িত্ব আবার কিসের অর্চনা? বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাইছ। কিন্তু চলতি রীতি তুমিও ভেঙেছ, আমিও মানি নি। দেহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আমারও প্রথম নয়, তোমারও প্রথম বলে মনে করবার কারণ দেখছি নে। সেকেলে শুচিবায়ুতায় তোমাকে যদি পেয়ে থাকে, সেকেলে মতে সামনের গঙ্গা থেকে একটা ডুব দিয়ে নিলেই সব দোষ কেটে যাবে।'

অর্চনা শুধু বলতে পারল, 'চুপ কর, তুমি চুপ কর।'

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ ক'রে রইল, তারপর গৌতমের সিগারেট ধরাবার শব্দে অর্চনা হঠাৎ চমকে উঠে বলল, 'তোমার ইচ্ছে আমি তোমার উপপত্নী হয়ে থাকি। কি স্পর্দ্ধা তোমার!'

গৌতম বলল, 'ছি ছি ছি! অমন একটা vulgar কথা কি ক'রে উচ্চারণ করলে অর্চনা? অন্তত ইংরেজী ক'রে বললেও তো অতটা কানে লাগত না, মনে লাগত না। হ্যাঁ উপপতি আর উপপত্নী। আমাদের সাধ্য কি যে আস্ত পতি-পত্নী হব। আমরা কি আস্ত বাপ, আস্ত ছেলে, আস্ত ভাই, আস্ত বোন, আস্ত বন্ধু? কোন্ সম্পর্কটা আমাদের ষোল আনা পুরো বল দেখি? সব সেই উপের দল। যাই কর, ঘর বাঁধো

আর নাই বাধো, শেষ পর্যন্ত আমাদেরও সেই উপেন্দ্র আর উপেন্দ্রানী হওয়া ছাড়া গতি নেই।'

অর্চনা উঠে দাঁড়াল।

গৌতম বলল, 'চললে যে?'

'কি করব বল, তোমার প্রলাপ শুনবার সময় আমার নেই। প্রবৃত্তিও গেছে।'

গৌতম বলল, হু। এতদিন তো প্রবৃত্তিটি বেশ ছিল?'

একথার কোন জবাব না দিয়ে অর্চনা এগিয়ে চলল।

দু'জনে ট্রামে উঠল। সামান্য একটু ফাঁকটুকুই যেন একমাত্র সত্য। আর সব ফাঁকি।

দিন কয়েক ভারি ফাঁকা ফাঁকা লাগল গৌতমের। কাজে কোন দিনই তার মন বসত না, এখন সেই মন একেবারে উড়ু উড়ু করে উঠল। দু-একবার আশা করল অর্চনা হয়তো খোঁজ নিতে আসবে। কিন্তু সে এল না। নিজের যেতেও বাধল। তা ছাড়া গিয়ে বলবেই বা কি? নতুন বলবার মত কথা তো কিছু জমেনি? ওর প্রশ্নের অন্য কোন জবাব দেওয়ার মত জোর কোথায় মনের?

বড়দিনের ছুটি পড়ল। কলকাতায় আর মন টেকে না। কি করবে তাই ভাবছে। শিল্পী বন্ধু মহীতোষ বলল, 'চল আমাদের সঙ্গে। ঘুরে আসবে ক'দিনের জন্যে।'

এক সময় গৌতমের স্বপ্ন ছিল ভবঘুরে হবে। কিন্তু তা আর হতে পারল কই! অফিস-ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে মনটা মাথা কুটে মরে। ছুটি-ছাটার দিনে কলকাতার সহরটা পরিক্রম করে ভবঘুরেমির সাধ মেটায়। মনে মনে বলে, এখানেই সব আছে। কলকাতাই তো পৃথিবীর মানচিত্র। এই বিচিত্র সহর ছেড়ে কোথায় যাব, যাওয়ার দরকারই বা

কি ?' কিন্তু এবার বড় দরকার বোধ করল গৌতম। মহীতোষের ডাকে সাড়া দিয়ে বলল, 'কোথায় যাবে ?'

মহীতোষ বলল, 'কুচবিহার। যেমন সুন্দর নাম, তেমনি ছবির মত সহর। চল দেখে আসবে।'

সেখানে মহীতোষের সম্পর্কিত আত্মীয় আছে। ছবি আঁকবার কিছু সরঞ্জাম সঙ্গে নিল মহীতোষ। আর নিল ভাইঝি সুদীপ্তিকে। থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে উঠেছে সুদীপ্তি। খুব চঞ্চল ফুর্তিবাজ মেয়ে। কাকার সঙ্গ সে কিছুতেই ছাড়তে চাইল না। বলল, 'প্রত্যেক বার তুমি একা একা ঘুরে বেড়াও ছোট কাকা। এবার আর ফাঁকি দিতে পারবে না।'

গৌতমের এক নিভৃত গিরিগুহার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এক কলস্বনা স্রোতোস্বিনী চলল সঙ্গে সঙ্গে। উপায় নেই, সব খরচ জোগাবে মহীতোষ। তাই ওর তুষ্টিতেই জগৎ তুষ্ট।

যাওয়ার আগে মাকে একটা পোষ্টকার্ড ছেড়ে দিল গৌতম। তাঁর সঙ্গে পরে দেখা করবে। তিনি যেন ভাবিত না হন। আর একখানা চিঠি লিখি লিখি করেও লিখল না।

গৌতমের প্রমোদ ভবনের বর্ণনা এখানে আর করব না কল্যাণদা। এমন কি কুচবিহার সহরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও বাদ দেব। তবে একটি দিনের একটুকরো ঘটনার কথা শুধু বলি।

'একদিন বিকেল বেলায় এক দোতলা বাড়ির সুন্দর একটি সাজানো ঘরে বসে তাস খেলছে চার জনে। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাগর-দীঘির জল। আর জলের ওপর সূর্যাস্ত। খেলায় বার বার হেরে যাচ্ছে গৌতম। মুখ টিপে টিপে হাসছে মহীতোষের বিজয়িনী বউদি। কিন্তু গৌতমের ক্রীড়াসঙ্গিনীর বিরক্তির সীমা নেই।

শ' পাঁচেক ডাউন দিয়ে সুদীপ্তি এক সময় ভ্রূকুঁচকে অধীর ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'না এমন আনমনা মানুষকে নিয়ে খেলা যায় না। জলের অত কি দেখছেন শুনি ?'

মহীতোষের বউদি বললেন, 'ওঁকে তুমি মিছিমিছি অমন ধমকাচ্ছ কেন দীপ্তি! গৌতমবাবু তো জল দেখছেন না জলের রঙ দেখছেন।'

সুদীপ্তি বলল, 'তাস খেলতে এক মাত্র তাসের রঙই ভদ্রলোকের দেখা উচিত চোখ রাখা উচিত রঙের তাসের দিকে।'

মহীতোষের বউদি বললেন, 'পাছে অনুচিত ভাবে অন্য কিছু দেখে নেওয়ার জন্যেই তো ওই জল দেখার ছল।'

সুদীপ্তির মুখের এবার রঙ বদলাল। কিন্তু একটু বাদে বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলল, 'শুনলেন তো গৌতমবাবু, প্রকারান্তরে কাকীমা আপনাকে কি রকম চোর বলে গাল দিলেন। উনি বলতে চান আড় চোখে ওঁর তাসের দিকে আপনি তাকাচ্ছেন। তাস খেলায় আমরা চোরের অপবাদও নেব, অথচ জিততে পারব না, তা কিছুতেই হবে না। আপনি বেশ শক্ত হয়ে বসুন তো। আর দোহাই আপনার, ওই বিশ্রী র‍্যাপারটা খুলে ফেলুন। এমন কিছু শীত পড়েনি যে অমন জড়োসড়ো হয়ে বুড়ো মানুষের মত বসতে হবে ?'

গৌতম হেসে বলল, 'আপনার ধারণা র‍্যাপার খুললেই আমরা জিততে পারব ?'

সুদীপ্তি বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা তাহলে রইল র‍্যাপার। শীতে যদি মরেও যাই তবু ক্ষতি নেই, তাস খেলায় আপনার জয় হোক।' কৌতুকের ভঙ্গিতে গৌতম খুলে ফেলল গায়ের চাদর।

মহীতোষের বউদি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'বাঃ আপনার সোয়েটারটি

তো বড় সুন্দর গৌতমবাবু! আপনি সেদিন বলেছিলেন মহীতোষের রঙ তুলিতে আর আপনার রঙ বুলিতে। কিন্তু আপনার এই সোয়েটারটিতেও তো নেহাৎ কম রঙ নেই? এটি পেলেন কোথায়?'

মনে হোল, জবাব শোনবার জন্যে সুদীপ্তিও উৎকর্ণ হয়ে আছে। গৌতম একটু ঢোক গিলে বলল, 'ওযাছেল মোল্লার দোকান থেকে কিনেছি।'

মহীতোষের বউদি একটু হাসলেন, 'কিনেছেন না কি? ভয় নেই, কত দাম পড়ল তা আর জিজ্ঞেস করব না। আপনার রকম-সকম দেখে ওটা যে চোরাই মাল তা টের পাওয়া যাচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে জুৎসই কোন জবাব মুখে জোগাল না গৌতমের। লক্ষ্য করল মহীতোষ মুখ মুচকে হাসছে। কিন্তু তার ভাইঝির মুখে হাসি নেই।

একটু বাদে সুদীপ্তি হাতের তাস ফেলে দিযে মহীতোষকে বলল, 'চল ছোট কাকা, এবার ঘুরে আসি খানিকটা। ঘরের মধ্যে বসে কত আর তাস খেলবে কুঁড়ে মানুষের মত।'

অথচ একটু আগে ব্রীজ খেলায় সুদীপ্তিরই উৎসাহ ছিল সব চেয়ে বেশি।

গৌতম সেদিন ঘুরতে বেরুল না। কিন্তু ওর মাথার মধ্যে একটি শব্দ অনুক্ষণ ঘুরে বেড়াতে লাগল,—'চোরাই মাল!' চোরাই মাল, কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি অর্চনার উপহারের জিনিস সে চুরি করে এনেছে, ফাঁকি দিয়ে এনেছে? তার বিনিময়ে কিছু দেয়নি? একেবারেই কিছু নয়? শুধু কথা বেচেছে, কথা গেঁথেছে, কথা সাজিয়েছে ওর জন্যে? আর কিছু দিতে চায়নি? কিন্তু দেওয়ার উপকরণ তো সকলের এক নয়, দেওয়ার মাধ্যমও আলাদা। গৌতম যা দিতে পারে তা শুধু কথার ভিতর দিয়েই দিতে পারে। কিন্তু তাই

বলেই কি দেওয়াটা মিথ্যে, কথা কতকগুলি শব্দ ? পুরোন এক কবি-বন্ধুর কয়েকটি লাইন মনে পড়ল গৌতমের—

এ তো শুধু কথা নয়
আমার সমগ্র সত্তা
সমগ্র হৃদয়
সমগ্র হৃদয় ভরা দুরন্ত বাসনা।

কবিতার টুকরোটি গানের কলির মত সারা রাত গুন-গুন করতে লাগল। পরের পুরোন কবিতা ভরেছে নতুন অর্থ-গৌরবে। এ যেন ওর সদ্য-লেখা নিজেরই কাব্য।

ভোরে উঠে গৌতম বলল, 'আমাকে আজই কলকাতা যেতে হবে।'

মহীতোষ বলল, 'সে কি ? এমন তো কথা ছিল না। থাকো না আর কয়েকদিন, একসঙ্গেই যাব।'

গৌতম বলল, 'না, ছুটি ফুরিয়ে গেছে। আর কামাই করাটা ভালো হবে না।'

সুদীপ্তি কেটলী থেকে কাপে চা ঢালছিল, গৌতমের দিকে না তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'ছুটি তো ইচ্ছে করলে বাড়িয়ে নেওয়াও যায়।'

গৌতম বলল, 'ছুটির মাধুর্য ছোটত্বে। তাকে বাড়াতে গেলে কাজের মতই ভারি হয়ে দাঁড়ায়।'

অফিসে দেখা হোল শ্যামলের সঙ্গে। কিন্তু ও শুধু গম্ভীরই নয়, নির্বাক্। গৌতমের সঙ্গে যে কোন দিন ওর কোন পরিচয় হয়েছে তা ওর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হোল না। টিফিনের সময় গৌতম ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর ব্যাপার কি ? কেমন আছ তোমরা ? তোমার অর্চনাদ—

শ্যামল ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ কর। ওঁর নাম তুমি মুখে এনো না।'

গৌতম হেসে বলল, আমার মুখে আনতে বাধা কি। মনে মনে জপ করার পালা তো তোমার।'

শ্যামল বলল, 'এখনো ওসব কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার, হাসতে লজ্জা করে না? এত দিনে তোমাকে চিনলাম। তুমি একটি scoundrel পাক্কা বদমাস। যাকে villain বলে তুমি তাই।'

গৌতম বলল, 'সত্যি না কি? এতদিন নিজেকে ভাবতাম পকেট-মার, ছিঁচকে চোর, আর প্রেমের ব্যাপারে ট্রাম-বাস-সঙ্গিনীর স্পর্শ-চোর চূড়ামণি। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। আরো চূড়ায় উঠেছি। একেবারে villain, তোমার কথায় খুব আত্মপ্রসাদ বোধ করছি শ্যামল। কিন্তু ব্যাপার খানা কি বল তো?'

শ্যামল বলল, 'তোমাকে বলবার কোন প্রয়োজন দেখিনে।' আর কোন কথা না বলে শ্যামল নিজের টেবিলে গিয়ে বসল।

অফিসে দু'জনের আর একজন যৌথ বন্ধু ছিল প্রসাদ সোম। অর্চনাকেও সে চিনত। খোঁজ-খবর রাখত সকলের। সংবাদপ্রিয় মানুষ। দীর্ঘদিন এক খবরের কাগজে কাজ করেছে। চাকরি ছাড়লেও সাংবাদিক-বৃত্তিটা ছাড়ে নি। গৌতম তাকে গিয়ে ধরল। জোগাল চা আর সিগারেট। জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর?'

খবর ভালো নয়। দিনে কয়েক আগে কাপড় মেলবার জন্যে ছাদে উঠতে যাচ্ছিল অর্চনা। উঠেও ছিল অনেক খানি। তারপর মাথা ঘুরে পা পিছলে একেবারে নিচে পড়ে গেছে। ব্লিডিং বন্ধ করার জন্যে ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছেন হাসপাতালে। রক্তক্ষয় বন্ধ হয়েছে। কিন্তু জ্বর যাচ্ছে না। দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই অচেতন হয়ে থাকে। সঙ্কট এখনও কাটেনি।

গৌতম কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলল, 'হঠাৎ এমন হোল।'

প্রসাদ সোম চামচেয় চপের টুকরো তুলতে তুলতে বলল, 'ঠিক হঠাৎ হয়নি।'

গৌতম একটু একটু করে সবই শুনল। সিঁড়ি থেকে অর্চনার পড়ে যাওয়াটা আকস্মিক। কিন্তু পড়ে যাওয়ার কারণটা আকস্মিক নয়।

গৌতম যেদিন মহীতোষদের সঙ্গ নিয়েছিল তার আগের দিন থেকেই অর্চনা খুঁজে বেড়াচ্ছিল তাকে। প্রথমে এল অফিসে। সেখানে গৌতম নেই। তারপর গেল ওর মেসে, সেখানেও না। সারা কলকাতা সহরে যতগুলি চেনা জায়গা ছিল—চায়ের দোকান, বন্ধুর মেস, আত্মীয়ের বাসা—কোথাও গৌতমের সাড়া মিলিল না। মহীতোষ আর তার তরুণী ভাইঝির সঙ্গে গৌতম বেরিয়েছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। কে জানে মহীতোষ সত্যিই সঙ্গে আছে কি নেই, সত্যিই সঙ্গে থাকবে কি থাকবে না কে জানে সত্যিই ওরা ফিরে আসবে কি আসবে না। আর এসেই বা কি? গৌতম তো তাকে শেষ কথা বলেই দিয়েছে। এর পরেও কি ওর সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি আছে অর্চনার? আশ্চর্য, এখনো তার লজ্জা হচ্ছে না? সেই ঘৃণ্য কাপুরুষটির পিছনে পিছনে ছুটে বেড়াতে এখনো তার আত্মসম্মানে বাধছে না, লজ্জায় ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না, অসাড় হচ্ছে না দু'টো পা?

কেবল পা কেন, সমস্ত দেহই যেন অসাড় হয়ে এল। কিন্তু অবুঝ মন অবাধ্য মন তাকে বিশ্রাম দিল না। সারা সহর ভরে নিঃসাড় দেহটাকে তাড়িয়ে বেড়াল, ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াল। হয়তো সত্যিই বাইরে যায়নি গৌতম, হয়তো কলকাতারই কোন জায়গায় লুকিয়ে আছে। যেখান থেকে ওকে খুঁজে বার করবে অর্চনা। সব বুঝিয়ে বলবে। যুক্তি দিয়ে বোঝাবে, ভালবাসা দিয়ে বোঝাবে। সেদিন শুধু বিরক্তই হয়েছিল, রাগ হয়েছিল, ঘৃণা হয়েছিল ওর ওপর। কোন

কথা বলতে পারেনি। আজ বলবে, 'দেখ, তোমার সব কথা ভুল, ও কেবল এক পেশে দৃষ্টি। আমরা টুকরো, আমরা খণ্ডিত তা ঠিকই। আমরা পুরোপুরি ভাই নই, বোন নই, মা নই, ছেলে নই। কিন্তু পুরো হওয়ার ইচ্ছে তো আমাদের আছে। এসো আমরা সেই ইচ্ছেকে রূপ দিই। রাগ ক'রে খণ্ডকে বহুখণ্ডিত না ক'রে এসো আমরা সেই টুকরোগুলিকে জড়ো করি, জড়কে জীবণ দিই।'

কিন্তু কথা বলবার জন্যে সামনে পাওয়া গেলনা গৌতমকে। শেষ পর্যন্ত মহীতোষের বাড়ি পর্যন্ত গেল অর্চনা। সেখানে গিয়ে আর কোন সংশয় রইল না। বাড়িতে কুচবিহারের নাম ওরা কেউ বলে যায়নি। তবে বিহারে বেরিয়েছে তা জানিয়ে গেছে।

এবার গৌতমকে অর্চনার দরকার। না, কিছু বলবার জন্যে নয়, বুঝবার জন্যে নয়, শুধু শাস্তি দেবার জন্যে। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠোরতম, নিষ্ঠুরতম শাস্তি। এমন শাস্তি যা কোন মেয়ে কোন পুরুষকে এপর্যন্ত দিতে পারেনি। এমন অপমান যা কোন মেয়ে কোন পুরুষকে এপর্যন্ত করতে সাহস পায়নি।

জীবন ভরে কি শুধু অপমান আর লাঞ্ছনা কুড়োবে অর্চনা? একবারও তার শোধ নিতে পারবে না? কেবল ঠকবে? সকলের কাছেই কেবল প্রতারিত আর প্রত্যাখ্যাত হবে? এমন কি গৌতমের মত নিতান্ত সাধারণ তুচ্ছ একজন পুরুষের কাছেও? এবার তো অর্চনার উঁচু আকাঙ্খা ছিল না। এবার তো সে পুরুষের ধন চায়নি, রূপ চায়নি, যশ চায়নি, পণ্ডিত্য চায়নি, চেয়েছে শুধু ভালবাসা। শুধু ভালবাসা তাহলেই হবে। যেই কেন হও, শুধু ভালোবাসায় অনন্য হবে তুমি। আমি তোমাকে সব দেব, তুমি আমাকে সব দাও। সেই দেওয়া নেওয়ায় ধন্য হই আমরা। আমাদের অন্য কিছুতে কাজ কি?

অর্চনাতো দিয়েছিল অর্চনাতো সমস্ত জীবন ভরে দিতে চেয়েছিল গৌতম তবু কেন নিল না, তবু কেন পরম অবহেলায় তার অর্ঘ ছুঁড়ে ফেলে দিল? কিসে ওর বাধল। অর্চনার দু'বছর বয়স বেশি বলে, ওর তারুণ্য যাই যাই করছে বলে? কিন্তু দেহের তারুণ্যই কি সব? তা কি গৌতমেরই একদিন যাবে না? সেই সঙ্গে সঙ্গে কি সব যাবে? সব যায়? গেলে বাচা যেত কিন্তু যায় কই।

ভিজে শাড়ি মেলতে যাওয়াটা ছল। অর্চনা একেকবার ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়, আবার নেমে আসে। কোথাও মন টেকে না। না উপরে না নিচে। না বাইরে না ভিতরে। না কারো সঙ্গে না নিঃসঙ্গতায়।

নিজের দশা দেখে নিজেই লজ্জিত হোল অর্চনা। বার বার নিজেকে ধিক্কার দিল। আর নয়, কাঙালপনা আর নয়।

অর্চনা বার বার সিঁড়ি বেয়ে উঠল, নামল আর মনে মনে কঠিন সঙ্কল্প করল, 'ওকে শাস্তি দিতে হবে, ওকে শাস্তি দেওয়া চাই।'

কিন্তু মনের সঙ্কল্প অটল রইলেও পা টলল। কাকীমা বার বার অদ্ভুত ভাবে তাকাচ্ছেন ওর দিকে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছেন, করতে পারছেন না। কিন্তু প্রশ্নটা স্পষ্ট হয়ে উঠল বলে, তখন কি বলবে অর্চনা? তখন কি জবাব দেবে? জবাব দিতে ভয় পাবে না অর্চনা, জবাব একটা দেবেই। ধমক দিয়ে মনকে স্থির রাখল অর্চনা।

তাই এবারো সবাই দেখল শাস্তি পেল অর্চনাই। ওরই পা পিছলে গিয়েছে। ওই মরেছে ওই পড়েছে নিচে।

কিন্তু এ শাস্তি কি কেবল ওরই? আমাদের দেশে মেয়েরা এমনি করেই পুরুষকে শাস্তি দেয়। নিজেরা নেমে পুরুষকে নামায়। নিজেরা ম'রে সমাজকে মারে।

বলা বাহুল্য, এ সব তত্ত্ব-কথা প্রসাদ সোম গৌতমকে বলে নি। সে শুধু সামান্ত তথ্যের জোগান দিয়েছিল। চপের পর চা, চায়ের পর সিগারেট ধরিয়ে গৌতমকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, 'অত ভাবছ কেন গৌতম, সিঁড়ি থেকে শুধু তো তোমার হাতই ওকে ঠেলে ফেলে দেয়নি, অতীতের আরো অনেক অদৃশ্য হাত এর পিছনে আছে।'

সেই দিনই বিকেলে হাসপাতালে গেল গৌতম। একটু সকাল সকালই গেল। পাছে অর্চনার আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ে গিয়ে পড়তে হয়। না, হলের শেষ প্রান্তে সাতাশ নম্বর বেডের কাছে এখনো ভিড় জমে নি। এক জন পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছরের দাঁড়ি-গোঁফ কামানো সুদর্শন প্রৌঢ় গম্ভীর মুখে টুলের উপর বসে রোগিনীর দিকে তাকিয়ে আছেন। গৌতমের পায়ের শব্দে তিনি মুখ ফেরালেন। নাম জিজ্ঞেস করলেন না, পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন না, তবু গৌতম বুঝতে পারল তিনি চিনতে পেরেছেন। বাবার রূপ-গুণের বর্ণনা যেমন মাঝে মাঝে গৌতমের কাছে করেছে, বর্ণনাও কি অর্চনা তেমনি তাঁর কাছে না ক'রে থাকতে পেরেছে? নার্স এসে টেম্পারেচার নিয়ে গেল।

অর্চনার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কত উঠল?'

'একশ' চার। ভাববেন না। ডাঃ দাস এক্ষুনি আসবেন [illegible] দিতে।'

সাদা একটা র‍্যাগে অর্চনার সর্বাঙ্গ ঢাকা। রুগ্ন বিবর্ণ মুখখানা ভারি করুণ দেখাচ্ছে। খানিকক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত থেকে অর্চনা একবার সামনের দিকে চোখ মেলল। শূন্য দৃষ্টি। সে চোখে পরিচয়ের আভাসমাত্র নেই। একটু বাদে কিসের একটা যন্ত্রনায় কাতরোক্তি ক'রে উঠল অর্চনা, 'উঃ!' তারপর পাশ ফিরতে ফিরতে বিড়-বিড় করে বলল, 'ওকে আসতে দিয়ো না বাবা, ওকে আর আসতে দিয়ো

না। আমার ভয় করছে ওকে আসতে দিয়ো না।' যেন একটি আট-নয় বছরের মেয়ে সত্যিই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে উঠেছে।

অর্চনার বাবা সস্নেহে একখানা হাত রাখলেন ওর গায়ে।

গৌতম মৃদুস্বরে বলল, 'এখনো ভুল বলছে বুঝি ?'

অর্চনার বাবা ফিরে তাকালেন, গৌতমের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন একটু কাল, বললেন, 'না, ভুল নয়, ওর ঠিক বলা।' তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

গৌতম কোন কথা খুঁজে পেল না। ওর মনে পড়ল একদিন অর্চনাকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিল তার বাবার সামনে, গৌতমের কথা সরবে না। সে ঠাট্টা যে এমনি মর্মান্তিক ভাবে সত্য হবে তা সেদিন কে ভেবেছিল ?'

মিনিট খানেক নিশ্চল, নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে গৌতম নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

এর পর থেকে গৌতমের কথাটা একেবারে বাদ দিলে গল্পের কোন ক্ষতি হবে না কল্যাণদা! কারণ এর পরের গল্প গৌতম অর্চনার গল্প নয়, শ্যামল আর অর্চনার গল্প। সে গল্প আকারে ছোট, প্রকারে বড। সে কাহিনীর খানিকটা আমার শ্যামলের চাল-চলন আর ক্রিয়া-কলাপ থেকে দেখা, খানিকটা তার স্বজন-বন্ধুদের মুখ থেকে শোনা। আর মাঝ খানের ফাঁকটুকু? গৌতমের মনে মনে বোনা কথা দিয়ে সে ফাঁক ভরে দেই কি বলো ?

গৌতম বেরিয়ে এল ঠিক নয়, বেরিয়ে গেল, এল শ্যামল। প্রথমে আসতে ভারি কুণ্ঠা, ভারি সঙ্কোচ, আর এক ধরনের বিতৃষ্ণা। প্রথম প্রথম বিতৃষ্ণাতেই মণ ভরে উঠেছিল শ্যামলের। এই সেই অর্চনাদি! তার কৈশোরের কত স্বপ্ন, কত মধুর স্মৃতি, কত শ্রদ্ধা আর প্রীতি দিয়ে

গড়া এই অর্চনাদির মূর্তি! কত গোপন কবিতার খাতা ভরে উঠেছে অর্চনাদির স্তবে। যে খাতা কাউকে দেখায়নি শ্যামল। এমন কি অর্চনাকেও নয়, পাছে ধরা পড়ে যায়। ধরা পড়ায় বড় লজ্জা। তা ছাড়া ধরা দিয়ে লাভই বা কি?

মফঃস্বল সহরের পাশাপাশি বাসা। শ্যামলের বাবা জজ কোর্টের পেশকার। আর অর্চনাব বাবা কলেজের অধ্যাপক। শ্যামল যেবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠল ঠিক সেই বারই অর্চনার বাবা যতীপ্রসাদ বাবু সহরের কলেজে ইতিহাস পডাবার চাকরি নিয়ে এলেন। সঙ্গে এল অর্চনা আর তার পিসীমা। মা-মরা ছোট ছোট দুই বোন থাকে মামাবাড়ীতে দিদিমার আশ্রয়ে, সেখানকার স্কুলে পড়ে, অর্চনা স্কুল ডিঙিযে ভরতি হোল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে। শ্যামল মনে মনে ভাবল, আমিও যদি স্কুলটা ডিঙাতে পারতাম!'

যতী বাবুদের একদিন নিমন্ত্রণ ক'বে খাওযালেন শ্যামলেব মা।

অর্চনা তাঁর রান্নার খুব সুখ্যাতি ক'রে বলল, 'কি চমৎকার সব রেঁধেছেন দেখেছ বাবা! পিসীমা কক্ষনো এমন রঁাধতে পারেন না। আমি মাসীমার কাছে রান্না শিখব।'

পিসীমা সামনেই বসেছিলেন, হেসে বললেন, 'তবে রে নেমকহারাম মেয়ে। আমার চেয়ে পাতানো মাসীমা'র আদর হোল বেশি। রান্না-বান্নায় কত তোমার মন! তুমি আবার রান্না শিখবে! যার ঘরে যাবে হাত পুড়িয়ে খেতে হবে তাকে।'

পাতানো মাসীমা কথাটা শ্যামলের মা'র খুব মনঃপূত হোল না। তিনি খুঁজে খুঁজে বের করলেন, সম্পর্কটা মোটেই পাতানো নয়। অর্চনার মা শ্যামলের মা'র আপন খুড়ীমা'র জেঠতুতো বোনের মেয়ে। তাই আত্মীয়তাটাকে খুব দূরের মনে করা ঠিক নয়। অর্চনার মা

বেঁচে থাকলে অন্তত করতেন না।

অর্চনার পিসীমাও যে করলেন তা নয়। দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াত খাওয়া-দাওয়া খুব চলতে লাগল। খুবই মেশামেশি হোল, দুটি পরিবারের।

সব চেয়ে বেশি মিল হোল শ্যামলের সঙ্গে অর্চনার। মিল হোল, আবার হোলও না। অর্চনা কলেজের মেয়ে আর শ্যামল স্কুলের ছাত্র। দু'জনের মধ্যে দু'বছরের ব্যবধান! অন্তত অর্চনার ভাব-ভঙ্গিতে সেই রকমই মনে হোত শ্যামলের। শ্যামল যত প্রমান চাইত সে দু' ক্লাস নিচে পড়ে বলেই সত্যি সত্যি নিচে প'ড়ে নেই, ইংরেজী বাংলা অনেক গল্পের বই পড়েছে! বাবার খবরের কাগজটি নিত্য পড়ে, খোঁজ-খবর অনেক বেশি রাখে পৃথিবীর বিশেষ করে নিজেদের সহরের নাড়ী-নক্ষত্র তার নখাগ্রে।

কিন্তু তবু অর্চনা ওকে আমল দিত না কেবল মুখ টিপে টিপে হাসত। শ্যামল যে ছোট তা যেন ওর ছটফটানিতেই প্রমাণ। নিজেকে বড় বলে জাহির করবার ছটফটানি।

আমল না দিলেও শ্যামলকে অর্চনা ভালোবাসত। ছোট বলে মেনেই ভালোবাসত! টুকটাক সৌখীন জিনিষপত্র আনতে দিত। পাঠাত এটা-ওটা দরকারে। সহরের আর এক প্রান্তে কোন বান্ধবীর বাড়ি থেকে বই নিয়ে আসতে হবে, শ্যামল ছুটত সাইকেল নিয়ে। কোন্ কোন প্রফেসারের স্ত্রী ব্লাউসের নতুন ডিজাইন আবিষ্কার করেছেন, শ্যামলের হাত দিয়ে আসত তার নমুনা। এই সব ছোট খাট কাজ করতে শ্যামলের ক্লান্তি ছিল না। অসম্মান বোধ ছিল না, কিন্তু আফশোষ ছিল। আরো কঠিন কাজ তাকে কেন করতে দেন না অর্চনাদি; কেন বলেন না তুমি সমস্ত পৃথিবী আমার জন্যে জয় করে

এনে দাও? কিন্তু তা না বললেও মাঝে মাঝে কাছে বসিয়ে, পাশে বসিয়ে তাকে গল্প বলত অর্চনাদি। কলেজের প্রফেসরদের গল্প, সহপাঠী-সহপাঠিনীদের গল্প। কে কেমন পড়ান, কে কেমন জামা-কাপড় পরে আসেন, কার কেমন চাল-চলন, কার কি মুদ্রাদোষ তাই নিয়ে হাসাহাসি হোত দু'জনের মধ্যে। কিন্তু যাদের নিয়ে হাসত, তাদের ভিতরে ভিতরে ভালও বাসত অর্চনা। বলত, উনি কিন্তু পড়ান ভালো। আর আসলে খুব ভালো মানুষ। প্রায়ই দেখা যায় ভালোমানুষের মুদ্রাদোষ বেশি, আসল দোষ কম। তাই না শ্যামল?'

শ্যামল ঘাড় নাড়ত, 'ঠিক বলেছেন অর্চনাদি। আমাদের অঙ্কের মাষ্টার মশাইও ঠিক ওই রকম। একটুতেই রেগে যান, বকাবকি করেন কিন্তু অঙ্ক বুঝান একেবারে জলের মত।'

অর্চনাদি যা বলেন তাই সত্য, যা করেন তাই ভালো। এমন মেয়ে আর হয়না।

শ্যামলের মা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন, অর্চনা তোর যখন বিয়ে হবে, তখন তোর এই ভক্ত শিষ্যটিকে সঙ্গে করে শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যাস্। ও যে তোকে একেবারে চোখের আড়াল করতে পারে না!

অর্চনা বলত, 'ঈস, আমি কোনদিন বিয়ে করবই না।

শ্যামলও সঙ্গে সঙ্গে বলত, 'আমিও না। আমিও কোন দিন বিয়ে করব না।'

শ্যামলের মা হাসতেন, 'বিয়ে করবার জন্য লোকে যেন ওকে কত সাধাসাধি করছে।'

অর্চনাও হেসে উঠত, 'সত্যি, আমাদের পনির সঙ্গে শ্যামলের বিয়ে দিয়ে দিন মাসিমা, বেশ মানাবে।'

পনি মানে পর্ণা। অর্চনার সব চেয়ে ছোট বোন। বছর নয়েক

বয়স। গরম আর পূজোর ছুটিতে বাবার কাছে এসে থাকে।

শ্যামল একথায় ভারি অপমান বোধ করত, 'বয়ে গেছে আমার এতটুকু মেয়েকে বিয়ে করতে।'

অর্চনার হাসি থামত না। 'শুনলেন মাসীমা? শ্যামল ছোট মেয়েকে বিয়ে করবে না। ওর জন্য এখন থেকেই পাত্রী দেখতে সুরু করুন। বেশ মোটা-সোটা লম্বা-সম্বা, বয়সে কযেক বছরের বড়।'

এই পরিহাস শ্যামলের অন্তরে বিঁধত। বযসে একটু বড হলেই যে দেখতে মোটা-সোটা আর বেঢপ লম্বা হবে তার কি মানে আছে! সে কি হতে পারে না সে কি হতে পারে না—। অর্চনাদির সঙ্গে মনে মনেও তার তুলনা করতে যেন ভয় হোত, লজ্জা হোত শ্যামলের। কিন্তু তুলনা না করেও পারত না, কল্পনা না করেও পারত না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবত, ছি ছি, এ বড় অন্যায়। নিজের কাছেও এ কথা স্বীকাব করা যায় না। তাতে লজ্জায় যে নিজেরই মাথা কাটা যায়।

এমনি ক'রে স্কুলের গণ্ডী ডিঙালে শ্যামল। ভরতি হোল কলেজে। যে কলেজে অর্চনাদি পড়েন। যে বিষয়গুলি নিজে পছন্দ করে নেওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে আগে পছন্দ করল ইতিহাস। শ্যামলের বাবার তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ইতিহাস যে অর্চনাদির বাবা পড়ান।

কাছে যাওয়ার জন্যে এত চেষ্টা, তবু ঠিক যেন কাছে যেতে পারলনা শ্যামল। অর্চনাদি উঠলেন বি-এ ক্লাসে। আই-এতে কলেজের মধ্যে সব চেয়ে ভালো রেজাল্ট হয়েছে তাঁর। প্রফেসরদের স্নেহ আর আদর ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রদ্ধা আর সম্মানে তাঁর একচেটিয়া অধিকার। শ্যামল সেখানে কে। শুধু তাই নয়, দু'বছরের মধ্যে যেন আরো দূরত্ব, নিজের চার পাশে আরো গভীর রহস্য মণ্ডল সৃষ্টি করলেন অর্চনাদি। থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের দু'একটি করে ছাত্র আসে ওঁদের বাসায়। ইতিহাস

যাদের পাঠ্য বিষয় নয়, তারাও আসে। তারাই যেন বেশি ঘন ঘন আসে। তরুণ প্রফেসরের দল। অর্চনার বাবার সঙ্গে তাঁরা নানা রকম অলোপ-আলাচনা করেন। অর্চনাও সে অলোচনায় যোগ দেয়। মাঝে মাঝে উঠে যায় চা দেওয়ার জন্যে।

কোন কোন দিন শ্যামল অনাহূত ভাবে সে ঘরে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু বেশিক্ষণ ঠাঁই পায় না। ফিরে আসতে আসতে ভাবে, কোন্ দুর্লভ গুণে অর্চনাদি ওঁদের সঙ্গে বন্ধুর মত আলাপ করেন, ওঁদের সমবয়সী হয়ে ওঠেন। আর কোন্ দোষে শ্যামল অর্চনাদির বয়সী হতে পারে না। ডিঙোতে পারে না মাত্র দু'বছর বয়সের ব্যবধান, মাত্র দু'ক্লাস বিস্তার দূরত্ব।

মাঝে মাঝে বিয়ের সম্বন্ধও আসে অর্চনাদির। শ্যামলের বুক দুরু-দুরু করে। কিন্তু দেখে খুসি হয় শেষ পর্যন্ত সব সম্বন্ধই ভেঙে গেছে। আসলে অর্চনাদির বাবার ইচ্ছা নয় মেয়ের এত সকাল সকাল বিয়ে দেন। বিয়েতে অর্চনাদিরও গভীর অনিচ্ছা।

কিন্তু একদিন যে কাণ্ডটা ঘটল সেটা ঠিক খুসি হওয়ার মত নয়। কলেজের প্রিন্সিপ্যালের বকাটে সেজো ছেলে হিরণ একদিন সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে এসে অর্চনাদির হাত চেপে ধরল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অর্চনাদি মারলেন তার গালে চড়। বাবার কাছে দিলেন নালিশ ক'রে।

যতী বাবু বললেন প্রিন্সিপ্যালকে, তিনি বিশ্বাস তো করলেনই না, বরং উল্টো দোষারোপ করতে লাগলেন অর্চনার। সহর ভরে নানা কথার ঢেউ উঠল। যতী বাবু মেয়েকে কলকাতার কলেজে ভর্তি করে দিলেন। মাস কয়েক বাদে নিজেও চলে গেলেন সেখানে।

ভারি দুঃখ লাগল শ্যামলের। মনে হোল এই বিচ্ছেদের দুঃখ বুঝি সহ্য করা যাবে না। এত দিন তবু তো অর্চনাদিকে দেখা যেত, তাঁর

সঙ্গে কথা বলা যেত, তাও বন্ধ হোল। এই শূন্য সহরে একা একা কি ক'রে থাকবে শ্যামল!

কিন্তু আশ্চর্য, থাকতে পারল। কয়েক মাস বাদে অর্চনাদির কথা আর তেমন মনে রইল না। কলেজের নিত্য নতুন বন্ধু, নিত্য নতুন বই, নিত্য নতুন আলোচনা-উত্তেজনা। এ সবের মধ্যে পুরোনো বান্ধবীকে কে ক'দিন মনে করে রাখতে পারে? বিশেষ করে যিনি সত্যি সত্যিই বান্ধবীর পর্যায়ে নেমে আসেননি, একটা দূরত্ব নিয়ে রয়েছেন।

এর পর কলকাতায় অর্চনার সঙ্গে যখন শ্যামলের দেখা, তখন বি-এ পাশ করে চাকরির চেষ্টা করতে করতে অনেক কঠিন অভিজ্ঞতা হয়েছে শ্যামলের। অনেক স্বপ্ন অনেক মোহের রঙ গেছে মুছে। অর্চনারও সেই প্রভাময়ী তেজস্বিনী মূর্তি আর নেই। জীবনের হাতে সেও মার খেয়েছে। কিন্তু তখনো একেবারে ধূলায় লুটিয়ে পড়েনি। ব্যর্থতার মধ্যেও নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তখনো শ্যামলের চোখে অর্চনা সুন্দর। সে সৌন্দর্য করুণ কোমল বিষন্ন কবিতার মত।

কিন্তু আজ কি হোল! শ্যামলের সেই মধুর মানসী মূর্তি ভেঙে একেবারে গুঁড়ো-গুঁড়ো হোল যে! কথা বলবার আর জো রইল না। মাথা তুলবার আর জো রইল না।

গোড়া থেকেই গৌতমের সঙ্গে অর্চনার ঘনিষ্ঠতা শ্যামলের চোখে অস্বাভাবিক লেগেছে। আশ্চর্য, অর্চনাদি কি পেলেন ওর মধ্যে? কোন দিক থেকে গৌতম ওঁর যোগ্য? শুধু সাজিয়ে কথা বলবার বিদ্যে ছাড়া আর কোন্ বিদ্যে জানা আছে ওর? জীবনে এত আঘাত এত অভিজ্ঞতার পরেও শিক্ষা হোল না অর্চনাদির! এখনো এই সাধারণ একটি চটুল ছেলের কথাবার্তায় ওঁর মুখে রঙের ছোপ লাগে, উল্লাসে উচ্ছল হয়ে ওঠে চোখ! আর যে সারাজীবন ধরে তাঁকে

শ্রদ্ধা আর সমীহর আড়ালে আড়ালে ভালোবেসে এল, তার দিকে তাঁর চোখই পড়ল না? আশ্চর্য মেয়েদের চোখ, তাদের একচোখোমি! তাদের হৃদয় শ্রদ্ধা দিয়ে খোলা যায় না, অন্তরের শুভেচ্ছা দিয়ে খোলা যায় না, ঘা মেরে মেরে দোর ভেঙে যে ঢুকতে পারল সে ঢুকল, আর কারো সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ভারি দুঃখ হোল, ভারি অভিমান হোল শ্যামলের। মাঝে মাঝে হিংসায় বুক জ্বলে উঠল। কিন্তু কিছুতেই আত্মবিস্মৃত হোল না শ্যামল। দৌর্বল্যকে ধরা পড়তে দিল না। এই নিয়ে অনেক ঠাট্টা তামাসা করল গৌতম, অনেক খোঁচা দিল। কিন্তু শ্যামল টলল না, টলল না। শুধু একদিন একটা দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছিল শ্যামল। আগের রাত্রে লাইটহাউস থেকে অর্চনাকে নিয়ে কি একটা ছবি দেখে গৌতম সাড়ম্বরে সেই গল্প করছিল, হঠাৎ প্রসঙ্গ ডিঙিয়ে শ্যামল জিজ্ঞেস করে বসল, 'আচ্ছা গৌতম, মেয়েরা তোমার মধ্যে কি পায় বল তো? আমি তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খুবই ভালোবাসি! আমি যদি মেয়ে হোতাম, তোমাকে বন্ধুর মতই ভালবাসতাম, প্রেমিক বা প্রণয়ী হিসেবে ভাবতে পারতাম না।' কথাটা বলেই লজ্জিত হয়ে পড়েছিল শ্যামল। অন্য প্রসঙ্গ এনে চাপা দিতে চেয়েছিল কথাটা।

কিন্তু গৌতম চাপতে দিল না, বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'মেয়ে তো হওনি, হ'লে বুঝতে মজা।' তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'তবে তোমার কথার মধ্যে খানিকটা সত্য যে না আছে তা নয়। খানিকটা কেন, অনেকখানিই সত্য। মেয়ে আর পুরুষের মধ্যে যে সৌহৃদ্য যে ঘনিষ্ঠতা, তা খুব কম সময়েই বন্ধুত্বকে ছাড়িয়ে প্রেমে গিয়ে পৌঁছোয়। একজন পৌঁছোয় তো আর একজন সেই লক্ষ্য ছুঁতেও পারে না। আমরা দূর থেকে

দেখি ওরা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। আসলে হাবুডুবু তো দূরের কথা, হয়ত গলা-জলও হয়নি, বুক-জলও হয়নি, নেহাৎই হাঁটুজল মাত্র।'

শ্যামল বলল, 'কিন্তু তাতে তো কিছু বাধে না?'

গৌতম জবাব দিল, 'বাধে তো নাই-ই, যেহেতু একজন পুরুষ আর একজন মেয়ে, একজনের হাঁটু-জল আর একজনের বুক-জলের সমান। সব সময় পুরুষের দৈর্ঘ্যই যে বেশী থাকে তা নয়। অনেক পুরুষের মনের চেহারা মেয়েদের তুলনায় খাটো। তাই তারা যে জলে সাঁতার দেয়, মেয়েদের সেখানে ডুব-জলও হয় না। অনর্থক জল ঘোলা হয়, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কারো জন্যেই আর এক ফোঁটা জল নেই, বালি চিকচিক করছে একেবারেই মায়া-মরীচিকা।'

শ্যামল বলল, 'তোমার কথাগুলিও আমার কাছে তাই লাগছে। তুমি কি প্রেমকে একটা অপার্থিব বস্তু বলে ভাব যা সংসারের নিয়ম-কানুন মানবে না? আমি যদি উপকার করে উপকার পাবার প্রত্যাশা করতে পারি, ভাইয়ের সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে, অন্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ক'রে ভালো ব্যবহারের আশাকরি আর ভালো ব্যবহার পাই, শ্রদ্ধা দিয়ে শ্রদ্ধা টানতে পারি, স্নেহ দিয়ে প্রীতি, তা'হলে ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসা পেতে পারিনে?'

গৌতম হেসে মাথা নাড়ল, 'না, সব সময় তা পার না। ভালোবাসা দিয়ে ভালো ব্যবহার পেতে পাব হয়তো। কিন্তু তাতে কি তোমার মন ভরবে? এই জন্যেই আমার মনে হয়, নারী-পুরুষের যে reciprocality তা অত্যন্ত দুর্লভ, অত্যন্ত ক্ষণিক। এক মাহেন্দ্রক্ষণের বস্তু সেই মাহেন্দ্রক্ষণকে জীবনে ক্ষণে ক্ষণে আমরা পাইনে। যদি পেতাম সহ্য করতে পারতাম না। জীবনের সব সম্পদ সেই ক্ষণপ্রভায় জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেত। মাঝে মাঝে যে বিদ্যুৎ চমকায় বাজ পড়ে,

তাতেই কি কম সর্বনাশ হয় ভেবেছ?'

শ্যামল বলল, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। জল থেকে গেলে বিদ্যুতে। কিন্তু তোমার সেই দুর্লভ বিদ্যুৎকে মানুষ কি ভাবে কাজে লাগিয়েছে দেখেছ? কল-কারখানার কথা তুমি বুঝবে না। দু'টি ঘরোয়া উদাহরণ দিই। আজকাল ক্ষণপ্রভা তোমার ঘরে সন্ধ্যাদীপ হয়ে জ্বলছে তাল পাখার মত ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে মাথায়।'

গৌতম বলল, 'তবু তো ভাই মাথা গরম হতে ছাড়ে না। দেখো পোষা বিদ্যুৎ আসলে বিদ্যুৎই নয়। ওটা সিনেমার ষ্টুডিওতে বানানো ঝড়ের মত। দেখলেই চেনা যায়, ঘরেই হোক, কল-কারখানাতেই হোক বিদ্যুৎকে তুমি যতই পুষে রাখ, আকাশের সব বিদ্যুৎকে তুমি উজাড় ক'রে নিতে পারবে না। সে তোমাকে চিরকাল দূর থেকে হাতছানি দেবে, জ্বালাবে, পোড়াবে, মাথায় বাজ হয়ে ভেঙে পড়বে, শুধু ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়ে ক্ষান্ত থাকবে না।'

শ্যামল চুপ ক'রে গেল। গৌতমের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। ও তর্কের রীতি মেনে যুক্তিসিদ্ধ পথে চলে না। উপমা থেকে উপমায়, রূপকে থেকে রূপকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, ওর সব কথা তাই রূপকথা। ও সেই রূপকথার পাখাওয়ালা ঘোড়ায় চড়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়। প্রত্যেক মেয়েকে ডেকে বলে, হও আমার ক্ষণপ্রভা, ক্ষণকালের সঙ্গিনী, যে কোন সময় মুখ থুবড়ে পড়তে পার, তারজন্যে ভয় পেয়োনা।

কিন্তু শ্যামল মাটির মানুষ। কাজের মানুষ। তার প্রিয়া শ্যামলা পৃথিবী। সে জানে মাটির নিয়ম মানুষকে মেনে চলতে হয়, না হলে নিজেই মাটি হয়ে যায় মানুষ।

আশ্চর্য, এই কথাটা কি ক'রে অর্চনাদি ভুলল শ্যামল ভেবে পায়না। তার যা বয়স, তার যা অভিজ্ঞতা তাতে তো এমন ভুল হবার কথা নয়।

শ্যামল একেক দিন ভেবেছে ওকে সাবধান করে দেয়। কিন্তু যেতে সঙ্কোচ বোধ করেছে। অর্চনাদি নিশ্চয়ই অন্য রকম ভাববে। ভাববে ঈর্ষা। অধম পুরুষের দুর্বল ঈর্ষা। কি দরকার। তা ছাড়া তিরিশ বছর বয়সে যে মেয়ে নিজে সাবধান হয় না, তাকে কার সাধ্য সাবধান করে। গতানুগতিক সংস্কারের ধার শ্যামলও ধারে না। তবু অর্চনার রোগের বিবরণ যখন শুনল, ওর সমস্ত মন ঘৃণায় আর বিতৃষ্ণায় বিমুখ হয়ে উঠল। না, যাবেনা। কিছুতেই যাবে না। যা হবার হোক। মরুক। নিজের কাজের ফল ভোগ করুক অর্চনা।

কিন্তু সেদিন আফিস থেকে ফিরে এলে চা আর জলখাবার এগিয়ে দিতে দিতে মা যখন বললেন, 'মেয়েটা বোধ হয় মারাই যাবে এবার। আহা হা। ভারি দুঃখ হয় ওর কথা ভেবে। কি মেয়ের কি দশা হোল। তোর মনে আছে শ্যামল—'

তখন শ্যামল হঠাৎ বলে উঠল, 'তুমি চুপ করো মা। আমার কিচ্ছু মনে নেই, কিচ্ছু মনে নেই।'

তার পর চায়ের আধ কাপ ফেলে রেখে পরোটার রেকাবি স্পর্শ না করে শ্যামল সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শ্যামলের বাবা শ্যামদাস বাবু পাশের ঘরেই ছিলেন, বললেন, 'দিলে তো ছেলেটার খাওয়া নষ্ট ক'রে। এখন বোঝো মজা।'

শ্যামলের মা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আহা, আমি কি ভেবেছি ও এমন করে বেরিয়ে যাবে? মেয়েটার জন্যে দুঃখ হয় তাই বলছিলাম। ইদানীং ওর কীর্তিকাহিনী শুনে আমি ওকে দু'চোখে দেখতে পারতাম না। তবু বড় দুঃখ হোল। ওর সেই মাসীমা মাসীমা ডাক—'

শ্যামাদাস বাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'দেখ, আমাকে কোনদিনও মেসোমশাই বলে ডাকত না। তবু আমার দুঃখ হয়েছে। কিন্তু দুঃখ

হলেই কি তা যেখানে-সেখানে বলে বেড়াতে হবে? একি বলবার মত জিনিস? তবু আমি কাল যতী বাবুর কাছে গিয়ে খোঁজ-খবর সব নিয়ে এসেছি। হাসপাতালে ঢুকিনি, কিন্তু আঙুর বেদনা কিনে দিয়েছি যতী বাবুর হাতে।

শ্যামলের মা সংক্ষেপে বললেন, 'বেশ করেছ।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা শ্যামল গেল হাসপাতালে। যতীপ্রসাদ গৌতমকে যে ভাবে বিদায় দিয়েছিলেন, শ্যামলকে সে ভাবে বিদায় দিলেন না, বরং বললেন, 'বোসো।' আর একটা টুল টেনে নিয়ে শ্যামল খানিক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। চেয়ে রইল অর্চনার দিকে। চাদর ঢাকা অর্চনা আজ ঘুমুচ্ছে। মুখ খানা শুধু বার করা। রুগ্ন শীর্ণ, ক্লান্ত করুণ একখানা মুখ। অসহায় এক বালিকার মুখের মত। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যুক্তিবাদী শ্যামলের দু'চোখ জলে ভরে উঠল। সমস্ত ঘৃণা, সমস্ত বিদ্বেষ, সমস্ত জ্বালা সেই এক ফোঁটা জলে গলে লীন হয়ে গেল।

তারপর থেকে রোজ ফলের ঠোঙা হাতে ফ্রীওয়ার্ডে গিয়ে হাজির হতে লাগল শ্যামল। একদিন ঘুম ভাঙল অর্চনার, একদিন চোখে পড়ল শ্যামলকে, বলল, 'তুমি!'

শ্যামল বলল, 'হ্যাঁ। কেমন আছেন, আজ কেমন আছেন?'

অর্চনা একটু হাসল,— 'ভালই, বোধ হয় বেঁচেই উঠলাম শেষ পর্যন্ত।'

শ্যামল বলল, 'বোধ হয় কেন, নিশ্চই বেঁচে উঠবেন। না বাঁচবার কি হয়েছে।'

অর্চনা বলল, 'তা ঠিক।'

সপ্তাহ দুই পরেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল অর্চনা, বিছানা নিল

মাণিকতলার সেই ছোট্ট ঘরে। কিন্তু বিছানায় স্থির হয়ে থাকতে পারে কই ?

শ্যামল বলল, 'আপনি ভাবছেন কেন অত ?'

অর্চনা বলল, 'নিজের জন্যে ভাবছি নে। স্কুলের মাষ্টারিটা ছিল অস্থায়ী, জানো বোধ হয়, একজনের বদলী দিচ্ছিলাম। তিনি এসে জয়েন করেছেন। আমাকে তো তোমরা উঠতে দেবে না যে অন্য কাজকর্মে চেষ্টা করব। এদিকে বাবাই বা একা একা কি করে চালাবেন। কেবল নিজেরাই তো নয়, কাকীমা রয়েছেন, সন্তু, মীরা রয়েছে।'

যতীপ্রসাদ বাবুর আর্থিক অবস্থার কথা শ্যামলের অজানা নয়। সেই যে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন তারপর আর চাকরি নেননি। অল্প মূলধনে একটার পর একটা ব্যবসা ধরেছেন, আর ছেড়েছেন। মাঝে মাঝে লাভ যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু লোকসান যখন সুরু হয়েছে, তখন তা সব শুদ্ধ টেনে নিয়েছে। এখন আর নতুন করে সুরু করবার মত অবস্থা নেই। বুঝতে পেরেছেন ব্যবসাটা নিজের ধাত নয়। সেই ইতিহাস নিয়ে পড়ে থাকাই ভালো ছিল। কিন্তু এখন ফের নতুন ক'রে চাকরিতে ঢুকতে ভয় হয়, চাকরি জোটানোও শক্ত।

শ্যামল তবু বলল, 'আপনি ভাববেন না।'

অর্চনা বলল, 'কিন্তু তুমি যদি এই নিয়ে ভাবতে যাও, সেটা আমার পক্ষে আরো ভাবনার কারণ হবে।'

কিন্তু একথা সত্ত্বেও শ্যামল মাইনের টাকা পেয়ে প্রায় অর্ধেক অর্চনার হাতে গুঁজে দিল। অর্চনা তো প্রথমে কিছুতেই নেবে না, বলল, 'তোমাদের চলবে কি ক'রে ?'

শ্যামল বলল, 'চলে যাবে কষ্টে-সৃষ্টে। একটা ট্যুইশান জুটেছে। তাতেও কিছু পাব। আপনি ভাববেন না।'

অর্চনা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'দেখ শ্যামল, আমার ভগিনী-পতিদের কাছে পর্যন্ত আমি হাত পাতিনি।'

শ্যামল এবার একটু হাসল, 'কিন্তু আমিতো কোন সম্পর্কেই আপনার কোন ভগিনীপতি নই। যদিও বহুকাল আগে রাজসাহীতে থাকতে আপনি তেমন একটা ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আমি ঘোরতর আপত্তি করেছিলাম, মনে আছে আপনার?'

অর্চনা চোখ নামিয়ে বলল, 'আছে।'

শ্যামল বলল, 'তা'হলে রাখুন টাকা। ভালো হয়ে উঠে সুদ সমেত শোধ দিলেই হবে।' ফের আর একবার নোট ক'খানা অর্চনার হাতের মধ্যে জোর ক'রে গুজে দিয়ে ওর হাতে মুঠি বন্ধ ক'রে দিল।

অর্চনার গা একটু শির-শির করে উঠল। কিন্তু সেই শিরশিরানিকে আমল না দিয়ে বলল, 'আচ্ছা রাখলুম।'

শ্যামল একবার ভাবল বাবা-মা'র কাছে কথাটা লুকায়। কিন্তু ক'দিন আর লুকিয়ে রাখতে পারবে ভেবে খুলেই বলল সব কথা।

বাবা মুখ গম্ভীর করলেন।

মা'র মুখও প্রসন্ন দেখাল না।

দ্বিতীয় মাসেও যখন এই কাণ্ড ঘটল শ্যামদাস বাবু রেগে উঠলেন, 'তুই ভেবেছিস কি বল দেখি? এই কি আমাদের দান-দাতব্যের সময়? বলে নিজেদেরই চলে না।'

শ্যামল বলল, 'ওদের অবস্থা আরো অচল বাবা তাছাড়া দান-দাতব্য তো নয়। চাকরি-বাকরি পেলেই ওঁরা শোধ করে দেবেন।'

শ্যামদাস বাবু বললেন, 'হুঁ, শোধ করার জন্যেই তুমি দিচ্ছ কিনা।

আমি যেন কিছু আর বুঝতে পারছিনে ?'

শ্যামল বলল, 'কি বুঝতে পারছেন আপনি ?'

শ্যামলের মা বললেন, 'বোঝাবুঝির কিছু নেই। তুমি ওখানে আর যেতে পারবে না শ্যামল। আমার নিষেধ রইল।'

শ্যামাদাস বাবু বললেন, 'হুঁ, তোমার নিষেধ মানতে ওর বয়েই গেছে কিন্তু এখন দুঃখ করো না। দুঃখ করার তোমার এখনই হয়েছে কি ?' ওর জন্যে দুঃখে তোমাকে জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে আমি বলে রাখলুম।'

শ্যামলের মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি থামো, মরাই যদি ভাগ্যে থাকে তো মরব। দুঃখের কপালই যদি ক'রে এসে থাকি সে দুঃখ আমার নেবে কে ?' বলে চোখে আঁচল দিয়ে শ্যামলের মা চলে গেলেন পাশের ঘরে।

শ্যামলের বুকের ভিতরে কিসের একটা খোঁচা লাগল। গেল মা'র পিছনে পিছনে। গিয়ে বসল মেঝের ওপর মা'র গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে। বলল, 'তুমি দুঃখ করছ কেন মা ? কিসের দুঃখ তোমার ?'

'কিসের দুঃখ আমার তুই বুঝিসনে ? তুই কি বলতে চাস আমি কিছুই টের পাচ্ছিনে ? তুই বাসায় যতক্ষণ থাকিস তার চেয়ে বেশি সময় থাকিস সেখানে। কিন্তু তুই তো জানিস সে কি। সে যা ছিল তা তো সে আর নেই।'

শ্যামল বলল, 'কিন্তু তা তো ফের সে হ'তে পারে।'

শ্যামলের মা বলে উঠলেন, 'কক্ষনো না, কক্ষনো তা হ'তে পারে না। তুমি সে কথা মনেও জায়গা দিয়ো না বাপু। টাকা দিতে চাও দাও, কিন্তু ওখানে তুমি আর যেতে পারবে না। ওর সঙ্গে তুমি আর দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে না। আমি বলে দিলুম।'

কিন্তু মায়ের এই নিষেধ ঠিক মেনে নিতে পারল না শ্যামল। দিনকয়েক বাদে ফের গেল অর্চনাদের ওখানে।

অর্চনার শরীর আজ-কাল অনেকটা ভালো হয়েছে। উঠে বেশ চলে-ফিরে বেড়াতে পারে। পারে বই-টই পড়তে। চাকরির চেষ্টায় বাইরেও বেরুতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর বাবা বেরুতে দেননি। বলেছেন, 'যাক আরো ক'টা দিন। বেরুতে তো হবেই। শরীরটাকে আর একটু শক্ত ক'রে নে।'

বিকেলে পশ্চিমের জানালার কাছে তক্তপোষটা টেনে নিয়ে আধা-শোয়া অবস্থায় একটা বাংলা মাসিক কাগজের পাতা উল্টোচ্ছিল অর্চনা, শ্যামল এসে ঘরে ঢুকল। চেয়ারটা নিজেই টেনে নিয়ে বসল সামনে।

অর্চনা কাগজ থেকে চোখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকাল, একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তোমার কি হয়েছে শ্যামল! শরীর কি ভালো নেই!'

মাত্র সামান্য দু'টি কথা। কিন্তু অদ্ভুত উদ্বেগ আর মমতায় ভরা। শ্যামলের মনে হোল, এমন করে অর্চনাদি অনেক দিন কথা বলেনি। অনেকদিন চোখ তুলে তাকায়নি এমন ক'রে। এ প্রশ্ন তো সাধারণ কুশল প্রশ্ন নয়, এ প্রশ্ন অনেক গভীর, অনেক উদ্বেগ-মধুর, অনেক বেদনা-ভরাতুর। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে শ্যামল এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। জানলা দিয়ে তাকাল বাইরের দিকে। বড় একটা বাড়ির দেয়ালে চোখ ঠেকে গেল। পাশের আর একখানা বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটি নুয়ে-পড়া ডাল। অগুণতি লাল কৃষ্ণচূড়ায় ভরতি।

আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে আনল শ্যামল, আস্তে আস্তে বলল, 'শরীর ভালোই আছে। কিন্তু মনে বড় অশান্তি পাচ্ছি।'

অর্চনা ফের একটুকাল ওর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, 'অশান্তির কারণ আমি একটু একটু আন্দাজ করতে পারছি শ্যামল!' তারপর একটু হেসে বলল, 'আমাকে নিয়ে অশান্তি, না?

অর্চনার বিধবা কাকীমা ঘরে ঢুকলেন, শেষ কথাটা তাঁর কানে গিয়েছিল। গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমার চা দেব এখন ?'

অর্চনা বলল, 'দাও, দু'কাপই দিয়ো।'

অর্চনার কাকীমা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ঘরে যখন দু'জন রয়েছ, তখন কি আর এক কাপ দেব ?' বলে চলে গেলেন, যেতে যেতে ভাবলেন, ধন্যি মেয়ে বাবা ! এই তো সেদিন—

কিন্তু একদিনের কথা কি আর একদিন মনে রাখা যায় ? জীবন তা মনে রাখতে দেয় না। সে নিত্য নতুন দিন এনে হাজির করে। তার নিত্য-নতুন সমস্যা। নিত্য-নতুন দুঃখ-সুখ।

শ্যামল বলল, 'ধরুন যদি তাই হয়।'

অর্চনা বলল, 'তা হতে দেওয়া ঠিক হবে না। আমার জন্য আর কেউ দুঃখ পাক, অশান্তি পাক আমি আর তা চাই নে।'

শ্যামল বলল, 'কিন্তু আপনি না চাইলেও কি আর একজনকে দুঃখ থেকে রেহাই দিতে পারেন ?'

অর্চনা বলল, 'কিন্তু আমার জন্যে কেন তুমি দুঃখ পাবে বল ? তুমি তো সব জানো ?'

শ্যামল একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'জানি। ওকে কি করে খবর দেব ? আপনি তাই চান ?'

এতদিন বাদে প্রথম উঠল গৌতমের প্রসঙ্গ। এর আগেও দু'জনের মনে তার কথা যে না উঠেছে তা নয়। কিন্তু দু'জনেই এড়িয়ে গেছে সেই একজনের কথা। কিন্তু আজ আর এড়িয়ে যাওয়া নয়, আজ শ্যামল চাইল সব পরিষ্কার করে নিতে।

অর্চনার মুখ একটু আরক্ত হোল, বলল, 'না, তুমি ভুল বুঝেছ, আমি তা চাই নে। যদি সে আসত, খবর না পেয়েও আসত। যদি

খবর দেওয়ার দরকার বোধ করতাম আমি নিজেই যেতাম। তোমাকে পাঠাতাম না?'

শ্যামল বলল, 'এমনও তো হ'তে পারে লজ্জাটাই সব চেয়ে বড় বাধা হয়েছে?'

অর্চনা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তাই যদি হয়ে থাকে সে বাধাকে না ভাঙাই ভালো।'

শ্যামল বলল, 'সে অবশ্য আমার কাছ থেকে, প্রসাদের কাছ থেকে সব খবরই পাচ্ছে।'

অর্চনা কোন জবাব দিল না।

কথাটা শ্যামল ঠিকই বলেছে। গৌতম সব খবরই পাচ্ছিল। শ্যামল যতটুকু বলত, তার চেয়েও বেশি কথা ওর কানে যাচ্ছিল, বেশি কথা টের পাচ্ছিল গৌতম। প্রথমে একবার ভেবেছিল দেখা করতে যাবে। তারপর ভাবল লাভ কি। গিয়ে কি বলবে, 'তোমার ভাগ্যের জন্য অভিনন্দন?' ওসব লৌকিক ভদ্রতা ওর আসে না। অবশ্য এত কাণ্ডের পরে একবার খোঁজ নিতে না যাওয়া একেবারেই অলৌকিক। তা হোক। এতে অবশ্য অর্চনা তাকে খুবই ভুল বুঝবে। তা বুঝুক তার এক ভুল ভাঙতে গিয়ে আর এক ভুলের সৃষ্টি করে দরকার নেই। বিশেষ ক'রে ওদের মধ্যে যখন একটা নতুন সম্বন্ধ গড়ে উঠবার আয়োজন হচ্ছে তখন আর তার মধ্যে মাথা গলাতে গিয়ে লাভ কি? মাথা গলিয়ে কোন লাভ নেই। অনর্থক মাথায় ঠোকা খেতে হয়। শ্যামলও এসেছিল একদিন মাথা গলাতে। পারল কই? এখন পারছে। এখন ওর পালা। আর পালাবার পালা গৌতমের। একথা স্বীকার করতে কষ্ট হয়, কষ্ট হয় হার মানতে। তবু হার না মেনে জো থাকে না। তা ছাড়া কেমন যেন একটা রেজিগনেশনের ভাব এসেছে ওর মনে।

লড়াই করবার ইচ্ছা যেন নেই, প্রতিযোগিতার ইচ্ছা উঠে গেছে। যার জন্যে প্রতিযোগিতা তার জন্যে মনের সেই আকুলতা কই? কই সেই বাসনার তীব্রতা? একথা নিষ্ঠুর, কিন্তু সত্য। অত্যন্ত নির্মম সত্য, দীর্ঘ দিনের যত্ন-লালিত গাছ-কুড়ুলের একটি কোপে লুটিয়ে পড়ে। কখনো বা সেই আঘাতকে অত স্পষ্ট ক'রে দেখা যায় না, তার শব্দ কানে শোনা যায় না, এমন কি ভালো ক'রে টেরও পাওয়া যায় না, অথচ ভিতরে ভিতরে মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়। গৌতম বুঝেছিল তার যাদুমন্ত্রের কাল শেষ হয়েছে। এখন যত মন্ত্র-তন্ত্র শ্যামলের হাতে। নিঃশব্দে সরে আসা ছাড়া আর কিছু করবার নেই গৌতমের। এই সরে থাকবার শিক্ষা সে পেয়েছে শ্যামলের কাছ থেকে। সে শিক্ষায় পৌরুষ নেই, শুধু প্রশান্ত আত্মপ্রসাদের ভান আছে 'আমি ছেড়ে দিলুম, ছেড়ে দিলুম।' কিন্তু তুমি ছেড়ে দিলে একথা যেমন ঠিক, তোমাকে ছাড়তে হোল এ কথাও তেমনি সত্যি। জীবন এমনি ছাড়তে ছাড়তে আর ছাড়াতে ছাড়াতে চলে। অনেক সময় ছেড়ে যায়, ছিঁড়ে যায়, তবু দিন দিব্যি চলেও যায়।

আরো মাস দুই গেল। শ্যামলের বাবা মা'র প্রতিকূলতা আর শ্যামলের অশান্তি বেড়েই চলল! ঝগড়া-ঝাঁটি কথা কাটাকাটি হ'তে লাগল সমানে। বাবা-মা'র মনে দুঃখ দিতে শ্যামলের কষ্ট লাগে, আবার নিজের কষ্টও অসহনীয় মনে হয়। এমনি সময় একদিন অর্চনা বলল, 'আমি একটা চাকরি পেয়েছি শ্যামল!'

'চাকরি? ভালই তো। কোথায়?'

অর্চনা বলল, 'সি, পি, তে কাটনী নামে জায়গা আছে জানো তো? সেখানকার একটা বাঙালী স্কুলে মষ্টারী পেয়েছি। ইণ্টারভিউ-টিউর দরকার হোল না। একেবারে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার এসে গেছে।'

বলে ড্রয়ার থেকে একখানা চিঠি বের করল অর্চনা।

শ্যামল গম্ভীর মুখে বলল, 'থাক, ও আমার দেখে দরকাই নেই।'

অর্চনা একটু হাসল, 'এত রাগ কিসের তোমার?'

শ্যামল নিজেকে সম্বরণ ক'রে শান্ত ভাবে বলল, 'না রাগের আর কি কারণ থাকতে পারে? এই গরমের মধ্যে, এই শরীর নিয়ে সি, পি, ছাড়া কোন জায়গা তো আপনার আর জুটল না?'

অর্চনা বলল, 'অত অযোগ্য ভেব না। জুটে ছিল। খুব কাছা কাছিই পেয়েছিলাম একটা।'

শ্যামল বলল, 'তবে নিলেন না কেন?'

অর্চনা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'নিতে ভরসা হোল না। সব সময় হাতের মধ্যে পাওয়াটাই বড় পাওয়া নয়। পাওয়ার বস্তুর চাইতে পাওয়ার ভাবটা বড়। বস্তু বড় ঠকায় শ্যামল, ভাব বস্তু ঠকায় না।'

আবার সেই দার্শনিক ধমক। না, এবার আর ঠিক ধমক নয়। খানিকটা আক্ষেপ, খনিকটা কাতরোক্তির মত। ধমকের বদলে ধমক দেওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছিল শ্যামল। কিন্তু আক্ষেপের সুর কানে যাওয়ায় চুপ করে রইল। ওর নিজের মনও ঠিক তৈরী নয়। বাবা-মা'র কথা বার বার মনে পড়ে। যেমন রাগ হয়, তেমন দুঃখও হয়। ভাবে, নিজের সুখটাই কি বড়? দু'একজন বন্ধুর কাছে পরামর্শ চেয়েছিল। তারা সায় দেয়নি; বলেছে সবুর করো, কালহরণ করো। এত তাড়া কিসের? কিন্তু যা অশুভ, তার জন্যেই কালহরণ। মন যাকে শুভ বলে জানে তার জন্যে কালক্ষেপ করলে আক্ষেপ ক'রে মরতে হয়।

তবু বাঁধা-ছাঁদা, যাত্রার আয়োজন চলতে লাগল। যতীপ্রসাদ বাবু মৃদু আপত্তি করেছিলেন, বলেছিলেন, 'ওখানে গিয়ে কি তোর শরীর টিঁকবে?'

'আমার মন ভালো থাকবে বাবা!'

'আচ্ছা তা'হলে ঘুরে আয়।'

শ্যামদাস বাবু বললেন, 'যাক, এতদিনে মেয়েটার সুমতি হয়েছে।'

যাওয়ার দিন অর্চনা বলল, 'তোমার শরীরটা তো তেমন ভালো না। তোমার আর ষ্টেশন পর্যন্ত গিয়ে কাজ নেই বাবা।'

যতী বাবু বুঝলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আচ্ছা, আমি না-ই গেলাম। গিয়ে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি দিস্।'

খানিকটা সময় হাতে রেখেই দু'জন গেল ষ্টেশনে। ইণ্টার ক্লাসের টিকেট একখানা কেটে দিল শ্যামল। খানিকটা দূর এগিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু অর্চনা রাজী হয় নি। জোর ক'রে তাকে থামিয়েছে। বলেছে, 'তুমি কোনদিন আমার কথার অবাধ্য হওনি। আজও হয়ো না।'

শ্যামল মনে মনে ভাবল, অবাধ্য না হয়েই যত ভুল করেছে।

রিফ্রেসমেণ্ট রুমে মুখোমুখি বসে চা খেল দু'জনে। কেউ বিশেষ কোন কথা বলল না।

তারপর দু'জনে ঢুকল প্লাটফর্মে। বোম্বে মেল দাঁড়িয়ে আছে। অর্চনা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর বেশি সময় নেই। চল ভিতরে গিয়ে বসি। এর পরে গেলে আর জায়গা পাব না।'

শ্যামল বলল, 'আপনার জায়গা ঠিকই আছে। চলুন আর একটু ঘুরে আসা যাক।'

ঘুরে আসতে আসতে সেকেণ্ড বেল পড়ে গেল। সবুজ নিশান উঁচু ক'রে ধরল গার্ড। অর্চনা তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিল, হাঠাৎ শ্যামল খুব জোরে ওর হাত চেপে ধরল, তার পর সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত ভীরুতাকে জয় ক'রে বলল, 'অর্চনা! তুমি যেতে পার না অর্চনা। তোমাকে যেতে দেব না।'

অর্চনা হাত ছাড়াতে আর চেষ্টা করল না, কারণ, একটু আগেই গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। ষ্টেশনে প্রিয়জনকে যারা বিদায় দিতে এসেছিল তারা নিজেদের বিচ্ছেদ-দুঃখ ভুলে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে এই নাটকীয় মিলন-দৃশ্যের দিকে।

অর্চনা বলল, 'চল তাহলে ফিরি।'

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সী নিল শ্যামল। কুলীর মাথা থেকে নামিয়ে নিল অর্চনার বাক্স-বিছানা।

অর্চনা বলল, 'আবার ট্যাক্সী কেন? বাসে গেলেই হোত।'

শ্যামল বলল, 'বাসেতো রোজই যাই। আজ বিশেষ দিন।'

পিছনের সীটে পাশাপাশি বসে অর্চনা বলল, 'যেতে তো দিলে না। এখন কি করবে?'

শ্যামল বলল, 'কি আবার করব, বিয়ে করব।'

অর্চনা বলল, 'ওরে বাবা! সখ তো কম নয়! একেবারে বিয়ে! আমার চেয়ে তুমি দু'বছরের ছোট সে খেয়াল আছে?'

শ্যামল বলল, 'গৌতমের বেলায় তোমার সে খেয়াল ছিল?'

অর্চনা একটু কাল চুপ ক'রে রইল, তারপর হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'তুমি না সাধু মানুষ! তোমার মনেও এত হিংসে! কিন্তু সে তোমার হিংসেরও যোগ্য নয়। সে বড় হতভাগ্য।'

গৌতমের কথা তুলে অর্চনাকে খোঁচা দিয়ে শ্যামল একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। খানিক চুপ ক'রে থেকে বলল, 'না, এখন আর আমাকে ছোট ঠিক বলতে পার না। এই কয়েক মাসে আমার কয়েক বছর বয়স বেড়ে গেছে।'

অর্চনা বলল, 'আর আমার বুঝি বাড়েনি?'

শ্যামল বলল, 'না।'

অর্চনা বলল, 'আচ্ছা, তা না হয় না বাড়ল, কিন্তু আমি তোমাকে কি দিতে পারব তাই ভাবি।'

শ্যামল বলল, 'ঠিক একদিনে হয় তো পারবে না। দিনে দিনে পারবে। তার জন্যে অপেক্ষা করব। আমি গৌতমের মাহেন্দ্রক্ষণকে মানিনে অর্চনা। জীবনের প্রতিক্ষণকে মানি। মাহেন্দ্রক্ষণ হঠাৎ একসময় আকাশ থেকে পড়ে না। তাকে তিলে তিলে গড়ে নিতে হয়, এসো আমরা তৈরী হই, এসো আমরা তৈরী করি।'

অর্চনা একটুকাল চুপ ক'রে রইল, তারপর বলল, 'তোমার কাছে গোপন করব না। গোপন তোমার কাছে কিছু নেইও। আমিও তৈরী করতেই চেয়েছিলাম। অবশ্য আর একজনের সঙ্গে। কিন্তু সঙ্গীটা সেখানে বড় নয়, তৈরী করার ইচ্ছেটাই ছিল বড। সংসার তৈরীর ইচ্ছে। আমার মনে হয়, সে তা বুঝতে পেরেছিল। সে ভাবল তাকে আমি তুচ্ছ করলাম। তাকে বলতে পারলাম না, তুমি যা আছ, তাই আমার কাছে যথেষ্ট। তুমি যা দিচ্ছ তাই আমার কাছে ঢের, তুমি যে ভাবে নিতে চাইছ, পেতে চাইছ আমি তাতেই খুসি। আমি তা বলতে পারলাম না শ্যামল, কেন বলব। আমি যে তা বিশ্বাস করিনে। ও ভাবল ওকে আমি ছোট করলাম; ও আমার কাছে উপলক্ষ হয়ে রইল, আমার লক্ষ্য আলাদা।'

শ্যামলের মুখের দিকে তাকিয়ে অর্চনা হঠাৎ থেমে গেল।

শ্যামল বলল, 'থামলে যে।'

অর্চনা মমতা-ভরা স্বরে বলল, 'ওর কথা শুনতে তোমার কষ্ট হচ্ছে শ্যামল! আমি তোমাকে খুব দুঃখ দিচ্ছি।'

শ্যামল বলল, 'তা দিচ্ছ। সে কথা অস্বীকার করব না। কিন্তু তবু বল। তবু তোমার মনের সব কথা একদিন বেরিয়ে যাক।'

অর্চনা একটু হাসল, 'সব কথা কি একদিনে বেরোবে? অনেক দিন বসে তোমাকে সে দুঃখ পেতে হবে শ্যামল! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই দুঃখ আমিও পাব। হয়তো তোমার চেয়ে বেশি ক'রেই পাব। এই শুধু সান্ত্বনা।'

শ্যামল বলল, 'যা বলেছিলে বল। সে যা ভেবেছিল আমিও তো তা ভাবতে পারি। আমিও তো ভাবতে পারি, আমি উপলক্ষ। তোমার জবাবটা আমারও শোনা দরকার।'

অর্চনা বলল, 'তা হ'লে শোন। যে জবাব তাকে সেদিন দিতে পারি নি, আজ তোমাকে তাই দিই। তাকে জবাব দেব কি। সে তো জবাব শুনতে চায়নি? সে শুধু প্রশ্ন ক'রেই খুসি, কথা বলে খুসি। নিজের কথার ধ্বনিতে সে নিজে পাগল, হ্যাঁ পাগল, তাই ঘরও তার কাছে গারদ। কিন্তু ঘর তো সত্যি সত্যিই তা নয় শ্যামল। ঘরকে অনাসৃষ্টি বলে ও যত গালই দিক, ঘর আমাদের সত্যিকারের সৃষ্টি। ঘর গড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেকে গড়ি, স্বামীকে গড়ি, সন্তানকে গড়ি। ও ভাবল ওকে আর গড়বার প্রয়োজন নেই। ও স্বয়ম্ভু। ওকে যেমনটি পেয়েছি ঠিক তেমনটিই নিতে হবে। না নিতে পারলে ওর ব্যক্তিত্বকে ছোট করব, ওকে অপমান করব।'

শ্যামল বলল, 'তা কি খানিকটা সত্যি নয়?'

অর্চনা বলল, 'না নয়, বুঝতে পারছি গড়ে নেওয়ার কথায় তোমার পুরুষত্বের অহঙ্কারে লেগেছে। কারণ তোমরা এতদিন উল্টো কথা বলেছ। তোমরাই শুধু আমাদের গড়ে নেবে, তোমাদের হাতেই শুধু আমরা গড়ন পাব, আমরা আর হাত-পা নাড়ব না। আমি বলি তা কেন। তোমরাও গড়বে, আমরাও গড়ব। দু'জনে মিলে দু'জনকে গড়ব। আসলে হয়ও তো তাই। কিন্তু বলবার বেলায় বাহাদুরীটা তোমরা একাই নাও। মা যখন বলেন, দিদি যখন বলেন, তোমাকে

গড়ছি, তোমরা কথা বল না। কিন্তু স্ত্রী যদি বলে সে কাজে আমিও একটু হাত দিতে চাই, তা হলেই তোমাদের জাত যায়।'

শ্যামল বলল, 'তাতো যায়ই।'

'যায় ? তুমিও এই কথা বলছ ? জাত কেন যায় শ্যামল ?'

শ্যামল বলল, 'আগে তোমার কথা শেষ করে নাও, পরে বলছি।'

অর্চনা বলল, 'আমার তো ধারণা জাত তাতে যায় না। এতদিন স্ত্রীরা ওকথা বলতে সাহস পেত না। তারা বয়সে ছোট ছিল, অভিজ্ঞতায় ছোট ছিল। বিদ্যে-বুদ্ধি প্রায় ছিলই না। এখন তো ধারণা বদলাচ্ছে, এখনো কেন জাত যাবে তোমাদের ?'

শ্যামল আস্তে আস্তে বলল, 'যায় অর্চনা। জোর ক'রে গড়তে গেলে, জোর-গলায় সে কথা বলতে গেলে শুধু যে জাতই যায় তাই নয়, শিব গড়তে আমরা বাঁদর গড়ে বসি। এই গড়নের কাজ নিয়ে গৌতমের সঙ্গে একদিন আমার তর্ক হয়েছিল। ও বলল, 'দেখ, তোমরা কেবল কান মলে গড়তে চাও। কিন্তু আসলে গড়তে হয় কানে কানে কথা বলে।' মিল আর অনুপ্রাসই অবশ্য ওর সম্বল। কিন্তু মাঝে মাঝে দু-একটা সত্যি কথা তার ভিতর থেকে ছিটকে বেরোয়। গড়বার এই রীতি শুধু যে দাম্পত্য সম্পর্কের বেলাতেই ঠিক তা নয়, সমাজ সম্পর্কেও সব সময় না হোক অনেক সময়েই এই কথা।

গাড়ি বাসার কাছে এসে পড়েছিল। অর্চনা বলল, 'সত্যিই তুমি বড় হয়েছ। তোমাকে শ্রদ্ধা করি।'

শ্যামল বলল, 'এতদিন ছিল স্নেহ। এখন শ্রদ্ধার কথা বলে ফাঁকি দিতে চাও। কিন্তু আমি অন্য জিনিস চাই অর্চনা।'

অর্চনা বলল, 'তা জানি। কিন্তু সে জিনিসও আলাদা কিছু নয়, ওই দুইয়ে মিলেই তৈরী।'

দিন কয়েক বাদে মেসের তক্তপোষে কাৎ হয়ে শুয়ে চা খেতে খেতে গৌতম সকালের কাগজে চোখ বুলাচ্ছে। শ্যামাদাস বাবু এসে উপস্থিত হলেন। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। উস্কো-খুস্কো চুল। মুখ ভরা খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি।

গৌতম তাঁকে বসতে দিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার?'

শ্যামদাস বাবু বললেন, 'ব্যাপার বড় সাংঘাতিক। শুনেছ বোধহয়, শ্যামল অর্চনাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে দু'একদিনের মধ্যেই কাণ্ড ঘটে যাবে।'

গৌতম বলল, 'এত তাড়াতাড়ি?'

শ্যামদাস বাবু বললেন, 'তাড়াতাড়ি মানে? ওর আর এক মুহূর্তও দেরি সইছে না। পাছে আর কোন দিক থেকে কোন বাধা আসে। পাছে আর কেউ মেয়েটাকে ছিনিয়ে নেয়। কি রত্ন! আচ্ছা ওর না হয় মতিভ্রম হয়েছে। কিন্তু তোমরা তো ওর বন্ধু-বান্ধব, তোমরা কি বাধা দেবে না?'

গৌতম বলল, 'কিন্তু আমাদের কথা কি ও শুনবে? আমরা কি করতে পারি।'

শ্যামদাস বাবু গৌতমের আরো কাছে এগিয়ে বসলেন, বললেন, 'আর কেউ পারুক না পারুক, এক মাত্র তুমিই পার, তোমার সেই জোর আছে।'

গৌতম তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

শ্যামদাস বাবু বললেন, 'তুমিই পার। ছেলেটা সোজা সরল মানুষ, বয়স অনুযায়ী বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি। তাই মেয়েটা ওকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। মেয়েটা বোধহয় বলেছে ওর আগেকার কেচ্ছা কাহিনী সব মিথ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে ও তাই বিশ্বাস করেছে। নইলে অমন মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে যায়? এক তো বয়েসে বড়। তাছাড়া কীর্তি-কাহিনীর কথা কে না জানে? তুমি নিজেও তো জানো গৌতম।'

কারো কাছে কোন দিন লজ্জা পায় নি গৌতম। মুখ নিচু করে একটু চুপ করে থেকে ফের চোখ তুলে বলল, 'জানি. তাই কি !'

শ্যামদাস বাবু বললেন, 'তুমি যে জানো সেই কথাটাই ভালো করে ওকে জানিয়ে দাও। ওকে বিশ্বাস করাও। তাতেও যদি না মানে—'

গৌতম বলল, 'যদি না মানে তা হলে ?'

শ্যামদাস বাবু বললেন, 'তা হলেও যেমন ক'রে পার ওকে বাঁচাও।' মেয়েটাকে কিছুদিনের জন্যে তুমি বাইরে-টাইরে কোথাও নিয়ে যাও গৌতম! তুমি নিতে চাইলেই যাবে। টাকা তোমার হাতে না থাকে তার ব্যবস্থা আমি করে দেব। এই শল্য চিকিৎসাই ওর দরকার। না হলে ওর ব্যাধি সারবে না। দিন কয়েক অবশ্য খুবই কষ্ট পাবে, খুব ছট-ফট করবে। কিন্তু তা বরং ভালো। নইলে ওই মেয়েকে ঘরে নিয়ে ওকে যে সারা জীবন ছটফট ক'রে মরতে হবে গৌতম!'

ছল-ছল ক'রে করে উঠল শ্যামদাস বাবুর দুই চোখ।

বয়োজ্যেষ্ঠকে গৌতম শ্রদ্ধা দেখায় না, সম্মান করে না। প্রচলিত আত্মীয় সম্বোধনগুলি তার মুখে আসে না। কিন্তু এই প্রৌঢ়ের অশ্রদ্ধেয় কথাগুলি তার মনে বিপরীত ভাবের উদ্রেক করল। এই হীন আচরণের তলায় সে দেখল এক মর্মাহত, বিক্ষুব্ধ কিন্তু সন্তানবৎসল বাপকে। মনে হোল তার নিজের বাবাও ঠিক এই রকমই করতেন। তিনিও বিপক্ষের শিবিরে যেতেন নিজের মান সম্মান ধর্মের বিনিময়ে ছেলের জীবন ভিক্ষা করতে !

গৌতম বলল, 'কাকাবাবু, আপনি ভাববেন না।'

শ্যামদাস বাবু বললেন, 'ভাবব না, তুমি কথা দিচ্ছ আমাকে ?'

গৌতম একটু ইতস্তত: করে বলল, 'আমরা ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খুবই চেষ্টা করব। আপনার কথা বলে—'

শ্যামদাস বাবু বললেন, 'হ্যাঁ আমার কথা ভালো ক'রে বলো। বলো, যদি শেষ পর্যন্ত কারো কথাই সে না শোনে তাহলে আমিও শোধ নেব। আমার কিছুই সে পাবে না। আমার বাড়ীতে ঢুকতে পারবে না সে। আমি তাকে ত্যাগ করব।'

গৌতম বলল, 'ও সব কিছুই আপনাকে করতে হবে না কাকাবাবু। সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে। আপনি শান্ত হয়ে বাড়ি যান।'

শ্যামদাস বাবু চলে যাওয়ার পর গৌতম একবার ভাবল নেবে না কি ওঁর পরামর্শ। নামবে না কি একবার শক্তি-পরীক্ষায়। তারপর নিজের মনেই হাসল। পরীক্ষায় ইচ্ছে করেই সে ব্লাঙ্ক পেপার দিয়ে এসেছে। এখন আর সে কথা ভেবে লাভ কি।

কিন্তু সত্যিই কি ব্লাঙ্ক পেপার? সব শূন্য? একেবারেই শূন্য? আজ এই মুহূর্তে অর্চনার তা মনে হতে পাবে। কিন্তু অনেক দিন বাদে, অনেক বছর বাদে অর্চনা যখন সব ভুলবে, সব জ্বালা সব গ্লানি যখন মুছে যাবে, সব ক্ষতি যখন ওর পূরণ হয়ে উঠবে, তখন যদি নতুন করে একবার ভাবে—গৌতম ফের নিজের মনে হাসল, ভাববার তখন সময়ই থাকবে বড়। একপাল ছেলেপুলে নিয়ে অর্চনার তখন নিশ্বাস ফেলবার জো থাকবে না কি!

অফিসে দেখা হোল শ্যামলের সঙ্গে! ততদিনে টেবিলটা বদলে নিয়েছে শ্যামল। অফিস বদলাবারও চেষ্টায় আছে।

গৌতম ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'ব্যাপার কি? বিয়ে করছ শুনলুম?'

শ্যামল বলল, 'কার কাছে শুনলে?'

গৌতম বলল, 'তোমার বাবা স্বয়ং পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ ক'রে গেছেন। এবার তোমার ত্রুটি স্বীকারের পালা।'